আমি চঞ্চল হে

বুদ্ধদেব বসু

ডি, এম, লাইব্রেরি

৪২। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট

কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার

ডি, এম্, লাইব্রেরি

৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা

এই বইয়ের রচনাকাল—১৯৩৫-৩৬

প্রথম সংস্করণঃ

শ্রাবণ ১৩৪৩

অগস্ট ১৯৩৭
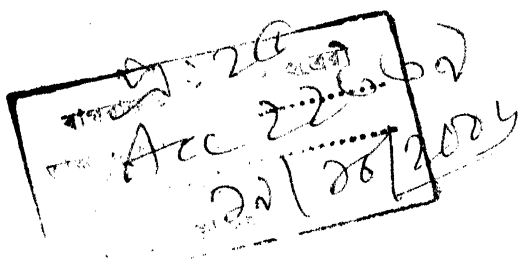
মুদ্রাকর—শ্রীশশিভূষণ পাল,

মেট্‌কাফ্ প্রেস্,

৯নং রাজা গুরুদাস ষ্ট্রিট—কলিকাতা

দাম ১।০

আবার পূজোর ছুটি এলো, আবার এলো শরৎ। বর্ষার পূবেল হাওয়া উত্তরে মোড় নিয়ে কোনাকুনি বইতে স্বরু করেছে, এ-খবরটা এই রাজধানীর অতি সংকীর্ণ ও গৃহবহুল গলিও চাপা দিয়ে রাখতে পারেনি। আকাশে সাদা মেঘের সাবলীল স্থাপত্য ভেঙে-চুরে মিলিয়ে গিয়ে এখন নীলের জোয়ার উপচে পড়ছে কানায়-কানায়; সর্পিল গলির দু'ধারে উঁচিয়ে-ওঠা বাড়িগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে হঠাৎ যেটুকু চোখে পড়ছে, তাতেই মনটা থেকে-থেকে প্রচণ্ড দোলা খেয়ে উঠছে। ঋতুর জগতে মস্ত একটা আলোড়ন যে চলেছে তার স্পষ্ট আভাস পাচ্ছি আকাশে বাতাসে শরীরের চামড়ায়। যেন দীর্ঘ অসুখের অশান্তি বিশৃঙ্খলার পরে কাপড়-চোপড় ধোবাবাড়ি পাঠিয়ে বিছানা-পাটি রোদ্দুরে দিয়ে নতুন ক'রে সংসার পাতবার আয়োজন।

আজকাল রাস্তায় বেরুলেই দেখতে পাই, ট্যাক্সি চলেছে মালপত্রে বোঝাই হ'য়ে ইষ্টিশানের দিকে। মনটা ঈর্ষার কামড়ে মুচড়িয়ে ওঠে। কী সুখী ওরা, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবি, কলকাতার হাটবাজার হিসেব-নিকেশ পিছনে ফেলে রেলগাড়ির কামড়ার কোণে একবার গ্যাঁট হ'য়ে যারা বসতে পেরেছে, তাদের মত সুখী

আর কে ! আর আমার মত দুঃখীই বা আর কে, এই অতুলনীয় ভ্রমণ-ঋতুতেও যাকে অল্‌-ডে টিকিটধারী নাবালকদের সংশ্রবে ট্র্যামে চ'ড়ে যেতে হচ্ছে কলকাতার এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায় ! 'ভবানীপুরের তেতলা বাড়িতে আলাপ চলছে সরু-মোটা গলায়—' আমার বাড়ি ভবানীপুরে হ'লেও তেতলা নয়, এবং সেখানে এবার সরু-মোটা গলায় যে-আলাপ চলছে, আবু পাহাড় ড্যাল-হাউসি দূরে থাক্, চিরকালের চিরচেনা দারজিলিঙের সঙ্গেও তার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। গেলো বছর উড়িষ্যার কোনো-কোনো জনপদে ভ্রমণের শেষে আমরা সামনের ছুটির জন্য যে-সমস্ত ভ্রমণের সংকল্প ক'রে রেখেছিলাম, এখন পর্য্যন্ত তাদের পূর্ণতার কোনো লক্ষণই দেখতে পাচ্ছিনে। হয়তো তারা পূর্ণ হবে—পরে—আরো পরে ? নাকি তারা বিস্মৃতির পাতালে তলিয়ে যাবে, যেখানে আমার কত অলিখিত গল্প কবিতার ভাঙা কল্পনার ভিড় ? ভবিষ্যতের নামহীন দেবতাই জানেন।

জীবনে যা চাই তা পাইনে, যখন পাই, তখন আর তা চাইনে, এই রকমের একটা কথা আছে। কথাটার পিছনে আছে বহু-যুগের বহু মানুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, তবু এর সঙ্গে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিনে। কথাটা এইভাবে বলা যায় যে আমাদের সমস্ত চাওয়ার পিছনে আছে এক হিংসুক নেমেসিস : তাকে এড়ানো প্রায় অসম্ভব। ধরা যাক্, এমন একদিন ছিলো যখন আমি অন্য সমস্ত কিছুর চাইতে এইটেই বেশি ক'রে চাইতাম যে আমার একটি বই ছাপা হ'য়ে বেরোক্। আর এখন সেই বইয়ের সংখ্যার ঠিক অঙ্কটা মনে রাখবার চেষ্টাও অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। এবং এখানে এসেই যে থামবে এমন আশা করবারও উপায় দেখিনে। আমাকে খেতে হয় : আমাকে লিখতে হয়। আমাকে

বাঁচতে হয় : আমাকে লিখতে হয়। এমন কি, এই যে কথাগুলো লিখছি, এ-ও আরো একটা বইয়েরই সূত্রপাত।

তবু জীবনে মাঝে-মাঝে মির‍্যাক্‌ল্‌ও ঘটে, তা না-হ'লে জীবন একেবারেই অর্থহীন হ'তো। কোনো আশা, কোনো কল্পনা —যা হয়-তো অনেকদিন ধ'রে মনের অন্তঃপুরে গোপনে লালন করেছি, তা একদিন সত্যি-সত্যি পূর্ণ হয় : যা চেয়েছি তা-ই ঘটে, যখন এবং যেমন ক'রে চেয়েছি, ঘটে সেই সময়ে ঠিক তেমনি ক'রেই। স্থান-কাল ঘটনার নৈমিত্তিকতায় চির-বন্দী আমরা, আমাদের পক্ষে এর চাইতে বড় সার্থকতা কিছু নেই। তা-ই হয়েছিলো গেলো বছর, যখন সমুদ্রে আর মন্দিরে আর হ্রদে, মর্মরে আর রোমাঞ্চে কয়েকটি দিন আমাদের কানায়-কানায় ভ'রে গিয়েছিলো।

—কয়েকটা দিন! পাঁজির হিসেবে সময়টা খুব বেশি হয় না, সত্যি। কিন্তু যখনই আমরা আমাদের পরিচিত পরিবেষ ও দৈনন্দিন নিয়মিত কাজের এলাকার বাইরে চ'লে আসি তখনই একটা কাণ্ড ঘটে। মুহূর্ত্তে দ্রুত হ'য়ে ওঠে সময়ের লয়। এখানে, আমাদের দিন কাটে শান্ত মন্থরতায়, নিয়মের মসৃণ আরামে; প্রতিটি দিন-রাত্রির চেহারা মোটামুটি তার পূর্ববর্ত্তীরই মত; কালকের দিন-রাত্রির কোন্ অংশ কী ভাবে কাটবে, আজ তা মোটামুটি ব'লে দেয়া যায় সহজেই। দিনগুলোর গায়ে ঘণ্টা-মাফিক কাজ, বিক্ষেপ ও বিশ্রামের খাঁজ কাটা, তার সাহায্যে তাদের চেহারাটা স্পষ্ট-নির্দিষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে। এবং এ-ও বলতে হবে যে জীবনের অধিকাংশ যাপন করবার পক্ষে এ অবস্থাই আদর্শ। দিনের প্রতি ঘণ্টায় যদি নতুন উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ ঘটতো তাহ'লে ও-কথাগুলোর কোনো অর্থই থাকতো

না, এবং জীবনটা নির্বোধ লাগতো এডগার ওয়ালেসের গল্পের মতই যেখানে প্রতি পাতায় একটা ক'রে খুন ঘটে। চিরন্তন পিকনিকের মত ক্লান্তিকর কিছুই নয়, যদি সেরকম কোনো জিনিস আমরা কল্পনাতেও আনতে পারি। যারা কেবল 'ফুর্তি' ক'রে জীবন কাটায়, আসলে তাদের মত ঘোরতর অসুখী আর কেউ নয়।

কিন্তু ওখানে, বাইরে, সবই অন্যরকম। এবং এ-রূপান্তর আরম্ভ হয় ইষ্টিশানে গিয়ে গাড়িতে ওঠবার মুহূর্ত্ত থেকেই। যেন প্রবেশ করি সময়ের অন্য কোনো স্তরে: গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দু'দিন কাটিয়েই মনে হয় যেন একমাস এখানেই আছি। কেননা দিন-রাত্রির গায়ের চিরপরিচিত খাঁজগুলো তখন হারিয়ে যায়, স্পষ্ট কোনো রেখা আর খুঁজে পাইনে। কখন্ শোয়া, কখন্ খাওয়া, কখন্ বেড়ানো কিছুরই ঠিক নেই, আর কাজ নামক অমন মস্ত জিনিসটাই একেবারে সশরীরে অনুপস্থিত। প্রতি মুহূর্ত্তে চোখে ও মনে নতুন ও অনভ্যস্ত ছাপ পড়ছে, দিনগুলো তাই যতিচিহ্নহীন এলোমেলো অস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এখানে গেলাম, এটা দেখলাম, ওটা করলাম: এই ক'রে-ক'রে একটা দিন অসম্ভবরকম স্ফীত হ'য়ে উঠে নিছক সময়ের সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়; একটা দিনের মধ্যে আমাদের মন যতবার ও যত নতুনভাবে নাড়া খায় বাড়িতে অভ্যস্ত জীবনে একমাসের মধ্যেও তা হয় না। এ-ও বোধ হয় বলা যায় যে বাড়িতে ব'সে আকস্মিক উত্তেজনাতেও মনে যে-ছাপ পড়ে, তা থেকে বাইরের এই ছাপগুলোর প্রকৃতিই আলাদা। পারিপার্শ্বিকের যেটা নিছক অভিনবত্ব সেটাই, আমার মনে হয়, সময়ের এই সম্প্রসারণের একটা কারণ। যেটা নতুন, যেটা অপরিচিত ও অনভ্যস্ত ব'লে

কখনো অদ্ভুত কখনো আশ্চর্য্য, তার সম্বন্ধে মনের প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই প্রবল। বাইরে গেলেই, সেইজন্যে, মনের ও ইন্দ্রিয়ের সচেতনতা অনেকগুণ সূক্ষ্ম হ'য়ে ওঠে; আমাদের দেখাতে অনেক বেশি দেখা, শোনাতে অনেক বেশি শোনা; আমাদের অনুভূতিতে অনেক বেশি অনুভব।

কেননা একটা জিনিস নিজের সত্তায় যতই আশ্চর্য্য কি অপরূপ হোক্, তার সম্পূর্ণ মহিমা উপলব্ধি করতে হ'লে বিস্ময়ের দৃষ্টি নিতান্তই দরকার। পুরীতে সমুদ্রের ধার দিয়ে নুলিয়ারা অন্যমনে হেঁটে যায়; যদি কখনো সমুদ্রের দিকে তাকায় তা শুধু এই দেখতে যে নবীন কোনো স্নানার্থীর সাহায্যকারীর প্রয়োজন আছে কিনা। পুরীতে আমরা যে-হোটেলে ছিলুম সেখান থেকে সমুদ্রদর্শনের অপূর্ব সুযোগ মেলে: কিন্তু সে-সুযোগ সম্বন্ধে আমাদের চমৎকার ম্যানেজারটি শুধু পয়লা নম্বরের একটা বিজ্ঞাপন হিসেবেই সচেতন। এবং তিনি যে অবশ্যতই স্থূলমনা কি নির্বোধ কি কল্পনাহীন তাও নয়। তাঁর অবস্থায় পড়লে আমারও কি প্রায় ঐ মনোভাবই ঠিক হ'তো না? ধরা যাক্, রোজ আমি বাস্-এ ক'রে নির্দিষ্ট একটি কর্মস্থলে যাওয়া-আসা করি; চৌরঙ্গির মোড়ে বড় সহরের তীব্র ফেনায়িত প্রাণস্রোত দেখে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠি ক'দিন? বলবেন কি, কোথায় সমুদ্র আর কোথায় চৌরঙ্গি! কিন্তু নগরের হৃৎপিণ্ডই কি সমুদ্রের চেয়ে কম বেগবান, কম রহস্যময়? তবু স্বীকার করতে হয় নগরের চেয়ে সমুদ্র নিজস্ব মহিমায় অনেক বেশি ব'লে ধোপেও টেঁকে অনেক বেশি। কিন্তু প্রতিরাত্রে আকাশে যে-তারাগুলো দেখা দেয়, প্রকৃতির প্রকাশ হিসেবে সমুদ্রের চেয়ে কম আশ্চর্য্য নয় নিশ্চয়ই? কিন্তু ক'দিন আমরা তাকাই, ক'জন আমরা তাকাই?

মনে করুন হঠাৎ যদি আকাশে একদিন তারা উঠতো, যদি বিশ্বের 'জটিল অঙ্কের কাটাকুটির' একটা ফল এই হ'তো যে পৃথিবী থেকে তারাগুলো বছরে একদিন মাত্র দেখা যাবে !

অভ্যাসের পরদা সরিয়ে যারা দেখতে পারে, তারা বিরল। এবং যারা পারে তারাও সব সময় পারে না। মুহূর্ত্তের এক বিদ্যুৎ-ঝলকে বাইরের খোলস ভেদ ক'রে দৃষ্টি প্রবেশ করে বস্তুর মর্মমূলে। এই 'দেখা' থেকেই সমস্ত আর্টের সৃষ্টি। এমনি উন্মোচন-মুহূর্ত্ত যার জীবনে যত বেশি আসে, নিঃসংশয়ে বলতে পারি সেই তত বড় ভাগ্যবান। এই 'দেখা'র ক্ষমতা নিয়ে যে জন্মায় সে তো বন্দী নয় তার পারিপার্শ্বিকের খাঁচায়, তার পারি-পার্শ্বিককে সে থেকে-থেকে নতুন ক'রে সৃষ্টি ক'রে নেয় আপন কল্পনার রামধনু-রঙে। আর এ-ক্ষমতা যার মধ্যে একেবারেই নেই, জীবন তার পক্ষে অতি সহজেই জীর্ণ হ'য়ে আসে, হাঁপিয়ে ওঠে সে পারিপার্শ্বিকের একটানা একঘেয়েমিতে, তৃষিত হ'য়ে থাকে নিছক ভৌগলিক পরিবর্তনের (যার মানে অনেক সময় নিছক জড়বস্তুর চেহারার পরিবর্তন) উত্তেজনার জন্য। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী হাজারবার চ'ষে বেড়ালেও তারা কি তার আণবিক ভগ্নাংশও পাবে যা পেয়েছিলেন রুগ্ন প্যাস্কেল ছোট খুপরিতে আবদ্ধ হ'য়ে থেকে ?

'জীবনে বৈচিত্র্য নাই', আমার এক কবি-বন্ধু একদা এই ব'লে আক্ষেপ করেছিলেন। কথাটা একহিসেবে এত সত্য যে প্রায় ধরা বুলির সামিল। কেননা আমাদের এই জীবনটার প্রকৃতিই এইরকম যে তার বৃহত্তম অংশ কাটে পুনরাবৃত্তিতে। প্রতিদিন একই গৃহে আমরা বাস করি, করি একই (কি একই রকমের) কাজ, ব্যবসার কি বন্ধুতার খাতিরে মিশি (মোটামুটি)

একই জনগুচ্ছের সঙ্গে। এমনকি, আমাদের (অন্তত আমাদের অধিকাংশের) নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র বাসন-কোষন কাপড়-চোপড় পর্য্যন্ত যথেষ্ট দীর্ঘকাল ধ'রে একই থাকে। রোজ নতুন সঙ্গী পওয়া অসম্ভব, এবং বৈচিত্র্যের খাতিরে যদি গল্প লেখা ছেড়ে নিজের হাতে মোটর বানাবার সখও হয় তা পূর্ণ করবার পথে বাধা বহু ও অনতিক্রম্য। চাই আর না-ই চাই, এই একঘেয়েমি আমাদের ললাট-লিখন।

কিন্তু আসলে বৈচিত্র্যের অভাব আমাদের জীবনে নয়, আমাদের মনে—অভাব আমাদের মনের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করবার ক্ষমতার। মনের একটা সহজ রসক্ষারণ আছে, যার সাহয্যে প্রতিদিনের পুনরুক্ত এই জীবন-প্রণালীতে আমরা সুখ পাই। প্রতিদিন সকালে ভাঁজ করা খবরের কাগজ খুলতে ভালো লাগে, ভালো লাগে স্নানের পরে চুল আঁচড়াতে, ভালো লাগে ঠিক সময়ে খাওয়া শোয়া, ভালো লাগে চায়ের সঙ্গে খুচরো গল্প। এই ভালো লাগাটাই স্বাভাবিক। একই কাজ, একই জিনিস প্রবৃত্তিগত কোনো উপভোগের সঞ্চারে বৈচিত্র্যে রসিয়ে ওঠে। এটা আমাদের ধর্ম। জাতির সংরক্ষণ ও চিরন্তনীকরণের জন্য প্রকৃতির যত ব্যবস্থা, এ-ও তার একটা। মানুষ যে বাঁচতে চায় তার মূল রহস্যই এইখানে।

বিপদ তখনই ঘটে, যখন অন্তর সেই বৈচিত্র্যের রস আর জোগান দিতে পারে না। তখনই ক্লান্ত লাগে, জীবনের গ্রন্থি যেন শিথিল হ'য়ে আসে, আত্মরক্ষার অন্ধ চেষ্টায় অন্ধের মত চারদিকে হাতড়াই। সাধারণ ছট্‌ফটানি খুঁতখুঁতানি থেকে মৃত্যুপম ক্লান্তি; সাধারণ ক্লান্তি, অবসাদ থেকে বোদলেয়ারের মুক্তিহীন তিক্ত বৈরাগ্য : এর আছে অসংখ্য সূক্ষ্ম স্তরবিভাগ। এটাই ভাগ্যের

কথা যে আমাদের বেশির ভাগকেই খুব বেশি নিচে নামতে হয় না। খানিকটা কিছু ভালো-না-লাগার জড়তার পরে আমরা ফিরে আসি স্বাভাবিকতায়। নিম্নতম নরকে যাঁরা অবতরণ করতে পারেন তাঁরা দেবতারই মত বিরল। মৃত্যুপম, মৃত্যুহীন ক্লান্তিকে মুখোমুখি দেখতে হ'লে বোদলেয়ারই হ'তে হয়।

এ-ও সত্য যে স্বাভাবিক উপভোগ-ক্ষমতা যাদের মধ্যে প্রচুর, যারা জীবন-শিল্পে প্রতিভাবান তারাও মাঝে-মাঝে ক্লান্তির আক্রমণ আর রোধ করতে পারে না, তাদেরও মন থেকে মাঝে-মাঝে এ-আক্ষেপ বেরোয়—জীবনে বৈচিত্র্য নাই। কী হয়? না, সমস্ত জীবনটার উপর যেন অভ্যাসের ঢাকনা প'ড়ে যায়, উপভোগের সূক্ষ্ম মুখগুলো সেই পুরু খোলস ফুঁড়ে পৌঁছতে পারে না। তখন, যে ক'রেই হোক্, জীবনটাকে নতুন ক'রে নিতে হয়। এবং সকলেই জানে, এই নতুন ক'রে নেয়ার সব চেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে—ভ্রমণ। কিছুদিন বাইরে ঘুরে ফিরে এলেই পুরোনো জীবনকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করি, নতুন—এবং দ্বিগুণ—উৎসাহ নিয়ে তাকে ভালোবাসি। চেস্‌টারটন সেই যে লণ্ডন থেকে গাড়িতে উঠে সহযাত্রীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি লণ্ডনে যাচ্ছি—প্যারিস, ভিয়েনা, বার্লিন, রোম হ'য়ে'—এই হচ্ছে সত্যিকারের কথা। আমরা যখন হাওড়া থেকে মুসৌরি কি উটকামণ্ড, ওয়াল্‌টেয়ার কি জব্বলপুরের উদ্দেশ্যে গাড়িতে চেপে বসি, তখন আসলে আমরা কলকাতাতেই যাচ্ছি; এ হচ্ছে আমাদের কলকাতা-আবিষ্কার-যাত্রা। ফিরে এসে কলকাতাকে নতুন ক'রে পাই, নতুন ক'রে পাই আমাদের বাড়ি-ঘর কাজকর্ম। ফিরে আসবার নির্দিষ্ট ঘর আছে ব'লেই ভ্রমণ সুখকর ও সার্থক।

ভ্রমণের সার্থকতা সম্বন্ধে ইস্কুলের ছেলের যে-সব রচনা লিখতে হয় তা আমরা সকলেই জানি। এবং সেখানে ভ্রমণের প্রতি যে-সব মহৎগুণ আরোপ করা হয় তা-ও জানি। এক কথায় বলতে গেলে, ভ্রমণ হচ্ছে মানসিক ডন-কসরৎ, বুদ্ধিবৃত্তির স্যাণ্ডো-সিসটেম। তাতে আমাদের পরিপ্রেক্ষিত হয় উদার, দৃষ্টি হয় সূক্ষ্ম, সংস্কারের সঙ্কীর্ণতা যায় কেটে ; তার ফলে আমরা দেখতে শিখি, ভাবতে শিখি ; সমস্ত শিক্ষার শেষ সম্পূর্ণতা সেখানেই। এ-সমস্ত কথায় বিশ্বাস করতে যদি পারতুম! কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই—কী? যা দেখতে পাই, তা বাঙলাভাষার 'ভ্রমণকাহিনী'গুলোর একটু পাতা ওল্টালেই বোঝা যায়। (অবিশ্যি রবীন্দ্রনাথের ঐ শ্রেণীর রচনা বাদ দিয়ে বলছি ; এবং রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে অন্য যে-কোনো কাহিনীর ক্ষণিক তুলনা করলেই প্রভেদটা স্পষ্ট হবে।) ইয়োরোপে বেড়িয়েছেন এমন বাঙালি স্ত্রী-পুরুষের আজ অভাব নেই, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত যাঁরা লিখেছেন তাঁদের সংখ্যাও নেহাৎ অল্প নয় ; এবং সে-সব লেখা প'ড়ে এটাই আমরা উপলব্ধি করি যে ঠিক যেমন বই পড়লেই শিক্ষা হয় না, তেমনি জলে স্থলে আকাশে বিভিন্ন যানে ঘোরা-ঘুরি করলেই ভ্রমণজনিত নানা মহৎ গুণ অন্তরে বর্তায় না। সেই এক বুড়ি জগন্নাথ দেখতে গিয়ে লাউমাচাই দেখেছিলো ; সেই এক প্রহসনের চরিত্র বোম্বাই সম্বন্ধে এই মন্তব্য শুধু করে-ছিলো যে সেখানে গাঁজার দাম বড় বেশি। লণ্ডনের হোটেলের বাথরুম কেমন সুন্দর, ভিয়েনার বাজারের মাংসের ষ্টল কী আশ্চর্য্যরকম পরিষ্কার, প্যারিসের প্রধান রাজপথে ক'টা ফুটপাথ এই ধরণের বহু তথ্য বঙ্গীয় পশ্চিমযাত্রীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা সহজ। এ নিয়ে অবিশ্যি আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই ;

কেননা আমরা যা দেখি, তা তো বাইরের কোনো বস্তু নয়; নিজেদেরই ভিতরে যা থাকে, তা-ই শুধু আমরা দেখি। এবং নিজেদের ভিতরে যা নেই, বাইরে আমরা কখনোই তা দেখতে পাবো না।

এই জন্যে এটা জোর ক'রেই বলা যায় যে ভ্রমণের প্রতি যে-মহৎগুণই সাধারণত আরোপিত হোক্ না, সকলের জন্যে সেটা নয়। সকল ক্ষেত্রেই এমনি; বিদ্যাভ্যাস থেকে লাভের সম্ভাবনা তো অপরিসীম, কিন্তু একই ক্ষেত্র থেকে আহরণের বিভিন্নতা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে যে কত বেশি ও কত বিচিত্র তা আমরা প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। কোনো জিনিসই নিরপেক্ষ শুভ নয়, সমস্ত সত্যই ব্যক্তিগত। একখানা বইয়ের মধ্যেও আপনি তা-ই পড়বেন, যা আপনার নিজের মধ্যে আছে; সেই জন্যে হাজার লোকের কাছে একই বইয়ের হাজার রকম অর্থ। এক যাত্রায় পৃথক ফল মানবপ্রকৃতির অনিবার্য্য নিয়ম। কেউ কালিদাস পড়বে শুধু অশ্লীল শ্লোকের আশায়, কেউ কাশ্মীরে গিয়েও শুধু গণিকা অন্বেষণ করবে। কেউ বাড়ি থেকে বাস্-এর রাস্তা পর্য্যন্ত হেঁটে যা সংগ্রহ করতে পারবে, অন্য কেউ আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্য্যন্ত ঘুরে এসেও তা পারবে না। এবং বাইরের ঘটনা থেকে কে কতটা আহরণ করতে পারবে তা অবিশ্যি নির্ভর একমাত্র তার নিজস্ব প্রতিভার উপর, যেটা সম্পূর্ণরূপে দৈব। ম্যাডাম, আপনাকে যুক্তি দিতে পারি, বুদ্ধি দিতে পারিনে। মহাশয়, আপনাকে একটি লাইব্রেরি ও রেল-কোম্পানির রিটর্ন টিকিট দিতে পারি, অভিজ্ঞতা অর্জন করবার ক্ষমতা দিতে পারিনে।

বই থেকে চরম রস নিষ্কাষণ করতে পারে যে-মানুষ,

যে পারে সুখী হ'তে নিজের মনে চুপচাপ একা ব'সে, ঠিক সেই পারে ভ্রমণ থেকে পূর্ণতম লাভ নিঙড়ে নিতে। ক্ষমতাটা একই, ক্ষেত্রটা শুধু আলাদা। বলা বাহুল্যমাত্র, ক্ষমতাটা খুব অল্প লোকেরই থাকে। অধিকাংশ—এবং অতিশয় অধিকাংশই—মূঢ়ের মত পড়ে, অন্ধের মত বেড়ায়, জীবনের নানা অনিবার্য্য ঘটনা থেকে মূল্যবান কিছুই সঞ্চয় করতে পারে না। ঘটনার নামই অভিজ্ঞতা নয়, ঘটনা হচ্ছে কাঁচা মাল যা থেকে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। এবং সেই সৃষ্টি—মনের বিশেষ একরকম রসায়নক্রিয়া—বিশেষ একটি ক্ষমতাসাপেক্ষ। সেটাই শিল্পীর ক্ষমতা বলা যায়। কেননা এটা দেখা যায় অভিজ্ঞতার প্রতিভা আত্মপ্রকাশের ক্ষমতার সঙ্গে প্রায়ই সংযুক্ত। বাঁচতে যে জানে, বলতেও সে পারে।

ভুল বললাম কি? ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করে কত লোক, প্রকাশ-ভঙ্গি যে সব সময় নিতান্ত অনিপুণ হয় তাও নয়, কিন্তু তাতে থাকে না দর্শন গ্রহণ মননশক্তির কোনো পরিচয়। যে লিখছে, বিশেষ একটি ব্যক্তি ব'লে তাকে ধারণা করতে পারিনে। নিজেকে সে দিতে পারেনি লেখার মধ্যে: আর তার কারণ কি এই যে তার নিজের মধ্যে দেবার মত কিছু নেই, নাকি ভাষার উপর এমন প্রভুত্ব তার নেই যাতে সে যথেষ্ট ক'রে বলতে পারে?

এ সূক্ষ্ম প্রশ্নের মীমাংসা কখনোই হবে না। অন্যপক্ষে, এমন লোকও তো কতই থাকতে পারে, অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষমতা যাদের আছে, কিন্তু যারা প্রকাশ-অক্ষম বলেই অজ্ঞাত রইলো। চট্ ক'রে কথাটাকে উড়িয়ে দেবার কিছু নেই। তবু এই শ্রেণীর লোক যদি থাকেও, বাধ্য হ'য়েই তাদের গণনার

বাইরে ফেলতে হয়, প্রকাশহীন ব'লেই তারা পরিচয়হীন। তাদের অভিজ্ঞতার মূল্য নির্দ্ধারণ করা স্পষ্টতই অসম্ভব।

এটুকু মাত্র নিরাপদে বলা যায় যে এই যুগ্ম ক্ষমতার আছে অসংখ্য স্তর বিভাগ; এবং যেখানেই জীবনের ও প্রকাশের এই উভয় ক্ষমতার অবিচ্ছেদ্য চরম স্ফুরণ, সেখানেই মহৎ প্রতিভা। পিরামিডের সেই সূক্ষ্ম সঙ্কীর্ণ চূড়ায় অতি অল্প লোকেরই আসন। কথাটা বলবার দরকার করে না, তবু বলি যে আমার স্থান সেখানে নয়। পিরামিডের তলার দিকে কোনোখানে একটু কোন আমার জুটতে পারে কিনা সে-বিষয়েও অনেকে সন্দিহান। আমার নিজের ধারণা, এইমাত্র আমি যে-শ্রেণীবিভাগ করেছি, তার মধ্যে 'অতিশয় অধিকাংশের' অন্তত আমি বাইরে। তার কারণ অবিশ্যি শুধু আমার অতিরিক্ত আত্ম-প্রীতি হ'তে পারে। বড় কষ্ট লাগে নিজেকে একেবারে জন-গণের মধ্যে গণ্য করতে। বিশেষ, জন-গণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে আমি সহজেই পারি, যখন ছাপার কাগজের আড়ালে লুকিয়ে ঐ মনুষ্যমাংস-পিণ্ডের উপর বক্রোক্তি করবার সুবিধে আমার আছে।

এই যে আমি কথাগুলো লিখছি তা কি এই প্রমাণ করতে যে আমি সেই স্বল্পসংখ্যকেরই একজন? কিন্তু কেন যে লিখি তা সত্যি আমি জানিনে। লিখতে হয়। কোনো ফরাসি লেখক কাগজে কলম ছোঁয়াবার 'initial vulgarity'র কথা উল্লেখ ক'রে গেছেন। কিন্তু সেই প্রথম পাপ কবে যে করেছিলাম ভালো ক'রে মনেও নাই। তারপর চলেছে। শুভ্র কাগজের কৌমার্য্য সম্বন্ধে প্রথম লজ্জা ও ভীতি একবার কেটে গেলে তারপর বোধ হয় ব্যাপারটা শাসনের বাইরে চ'লে যায়। অন্তত, কারো-কারো পক্ষে। নয় তো যা-কিছু দেখি, শুনি,

ভাবি, অনুভব করি, সবই প্রকাশ করতে যাওয়া (হোক্ না সে প্রকাশ বিশুদ্ধীকৃত, রূপান্তরিত)—ভেবে দেখতে গেলে এর ভাল্‌গারিটি অসহ্য। আমরা যারা লিখি, অভ্যেসে গা-সহা হ'য়ে গেছে বলেই বোধ হয় সহ্য করতে পারি।

কেন লিখি, সত্যি ? কেন লিখছি এই কথাগুলো ? কলকাতা থেকে তিনশো মাইল দূরে এক জায়গায় গিয়ে একদিন সকালে খুব ভালো আমার লেগেছিলো, এটা কি এতই বড় কথা যার জন্যে এখন হাজার কথার জাল বুনতে হবে ব'সে-ব'সে ? কিন্তু মনে পড়ে যে, থেকে-থেকে কেবলই মনে পড়ে। আলো এলিয়ে পড়ে বিকেলের আকাশে, মনে পড়ে। মাঝ-রাতে তন্দ্রার উপর দিয়ে গড়িয়ে যায় বালিগঞ্জের রেলগাড়ির দূর, মন্থর শব্দ। হঠাৎ বেজে ওঠে গঙ্গার ঘাটের জাহাজের শিঙা, ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে যায়, শুয়ে-শুয়ে ভাবি। আবার বেজে ওঠে দীর্ঘ, গম্ভীর নিঃস্বন ; শুনতে-শুনতে বুকে এসে লাগে অজানা সমুদ্রের এলাচগন্ধী হাওয়ার ঝাপটা। মনে হয়, এই জাহাজের এঞ্জিন ধ্বক্‌ধ্বক্ ক'রে উঠলো, খালাসিরা দড়ি-দড়া নিয়ে ব্যস্ত, জলের উপর রাতের অন্ধকার থমথম করছে, ধীরে ঘুরে যাচ্ছে অস্পষ্ট বন্দর—ভেসে পড়লাম।

সত্যি বলতে, জগতে যতরকম শব্দ আছে তার মধ্যে স্তব্ধরাত্রে এই জাহাজের শিঙার মত এমন রোমান্টিক, এমন কল্পনা-উদ্দীপক আমার কাছে আর কোনোটাই লাগে না। এ-শব্দ শুনলেই আমার মন উদাস হ'য়ে যায়, যমুনাকূলে কৃষ্ণের বাঁশির মতই মনকে এ-ঘর ছাড়া করে। সেই ধ্বনির ধাক্কা খেয়ে মন উড়ে চলে কত নতুন আকাশ, কত অজানা সমুদ্রের উপর দিয়ে। আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী—এটা এই অবস্থারই

কথা। এ-অবস্থা নেশার। সব নেশাই সাময়িক, কিন্তু প্রায় সব নেশাই থেকে-থেকে ফিরে-ফিরে আসে। কেটে যায় তখনকার মত, আবার আচ্ছন্ন করে। ক্রনিক না-হ'লে তো নেশা বলে না।

দুঃখের বিষয়, মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই। এবং যে-ইষ্টিমার অমন রোমান্টিক সুরে ডাকে, তা কবিকে মাশুল রেয়াৎ করে না; এবং তার চেয়েও যা শোচনীয়, কখনো-কখনো মাশুল জুটলেও অন্য-কোনো বাধায় আটকে থাকতে হয়। কিন্তু কাঁধে আমার ডানা না-ই থাক্, হাতে আমার কলম আছে। এবং সেই কলম নিয়ে বসলে আমি যে-জগতে পলায়ন করতে পারি, তা এ জগতের চাইতে নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর, যেখানে আমি খাই, ঘুমোই, জিনিস কিনতে দর-দস্তুর করি। আমার এই মানস-ভ্রমণের রোমাঞ্চও বড় কম নয়। এমনকি, গেলো বছরের রোমাঞ্চিত দিনগুলোকে নতুন ক'রে আবার সৃষ্টিও করতে পারি হয়-তো। লাভটা ডবল হ'লো। তখনকার মত অনুভূতি-গুলি তো পেয়েছি, তার উপর এই স্মরণের সুখ। সময়ের সমুদ্রে স্মৃতির জাদু-ঘেরা দ্বীপ যেন। আমিই তা তৈরি করছি, এই কথাগুলো দিয়ে; যা দেহহীন, নামহীন, চির-পলাতক, তাকে বাঁধতে চাইছি একটি নির্দিষ্ট ও স্পর্শসহ রূপে। জীবনের সমস্ত আনন্দকেই স্মৃতির এই মায়া সম্পূর্ণ করে। প্রথম আনন্দ হচ্ছে করবার; তারপর মনে করবার, ভাববার আনন্দ। দুয়ে মিলে পূর্ণতা।

২

সেদিন আমার এক মফঃস্বলবাসিনী আত্মীয়া আমাকে বলছিলেন :

'কলকাতায় কী ক'রে থাকো! এই তো খাঁচার মত ফ্ল্যাট, চলতে-ফিরতে গায়ে-গায়ে ঠোকাঠুকি। ধোঁয়া। ধুলো। অসুখ। খরচ। খাওয়ার জিনিসের যা দাম। তবে হ্যাঁ—কাপড়-চোপড় পাওয়া যায়।'

প্রতিটি কথাই সত্য, অনস্বীকার্য্য। কলকাতার বাতাসে বিষ, অন্নে বেরি-বেরি, জলে টাইফয়েড, ও দুধে জল। এখানে আমাদের অধিকাংশের জন্যে যে-আকারের ও যে-রকমের বাড়ি জোটে তা দেখে মফঃস্বলবাসীর হাসিই পায়; এবং তার জন্যে যে-ভাড়া দিতে হয়, মফঃস্বলের কোনো গ্রাম্য সহরে তা দিয়ে খোদ মাজিষ্ট্রেরের কুঠি দখল করা যায়। এই ঘনমেঘে একমাত্র রূপোলি রেখা যদি এই হয় যে এখানে দোকানে-দোকানে বস্ত্রের বৈচিত্র্য, আমার মনে অবিশ্যি সেটা কিছুমাত্র রেখাপাত করতে পারে না।

তবু আমরা কলকাতায় থাকি, থাকতে ভালোবাসি, কলকাতা ছাড়া অন্য-কোথাও থাকবার কথা ভাবতে পারিনে। 'আমরা' মানে এখানে আর-কেউ হোক্ আর না-ই হোক্, আমি নিশ্চয়ই। আমার মতই কলকাতা-প্রেমিক আরো অনেকে হয়-তো আছেন, তবু নিজের হ'য়ে কথা বলাই ভালো।

নিজের কথাই বলি। কলকাতায় গৃহ সঙ্কীর্ণ, রোগ বহুল, আহার্য্য দুর্মূল্য ও (এটা আমার আত্মীয়া উল্লেখ করতে ভুলে' গেছলেন) আকাশের তারা দুর্লভদর্শন; তবু কোনো প্রলোভনেই আমি কলকাতা ছেড়ে যাবো না। আছে আমার মনে কলকাতার এক মোহ, যেটা কাটিয়ে ওঠা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কী এই মোহ? কলকাতার এই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের গোপন রহস্য কোন্‌খানে? কেন, এত সব স্পষ্ট ও অনুপেক্ষণীয় অসুবিধে সত্ত্বেও কলকাতাকেই আমি ভালোবাসি?

কেন? জানিনে। কেউ জানে না। কলকাতায় যারা থাকে, তারা থাকে, বাইরে মন টেঁকে না। তেমনি, মফঃস্বলে যারা থাকে, কলকাতায় এসে থিয়েটার বায়োস্কোপ ও মনোহর বস্ত্র-বিপণী সত্ত্বেও সাতদিনেই ওঠে হাঁপিয়ে। এ হচ্ছে নিছক শারীরিক কতগুলো অভ্যাসের বৈষম্যের কথা।

কথাটা যদি একমাত্র এ-ই হ'তো তাহ'লে এ নিয়ে কোনো আলোচনারই ক্ষেত্র থাকতো না। কিন্তু সত্যি, ব্যাপারটা কী হয়? কখনো ভেবে দেখিনি, কিন্তু ভেবে দেখবার মত এটা। ধরা যাক্, এত সব পার্থিব ক্লেশ সত্ত্বেও কলকাতার উপর কেন আমার এই অনাক্রমণীয় অনুরাগ? এমন-কোনো লাভ—অন্তত লাভের সম্ভাবনা—নিশ্চয়ই আছে, যাতে ও-সমস্ত পুষিয়ে গিয়েও বেশি হয়। কী সেটা? সেটা কি এই যে এই রাজধানী কালচারের কেন্দ্র, এবং যেহেতু আমি কিনা মগজওয়ালা মানুষ, এখানকার আনুশীলনকি হাওয়ার বাইরে গেলেই ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে থাকি? নাকি এই যে আমি পার্থিব উচ্চাশায় প্রণোদিত, এবং এটা তো সবাই জানে যে বুদ্ধির জোরে

যে বড়লোক হ'তে চায় তার পক্ষে কলকাতা ছাড়া জায়গা নেই। কিম্বা হয়-তো তারই আকর্ষণ আমার পক্ষে সব চেয়ে বড়, খুব সংক্ষেপে যাকে বলা যেতে পারে 'ফুর্ত্তি'? মানে, বিশেষ এক রকমের ফুর্ত্তি, যার ইংরিজি নাম গুড টাইম, ভোজ, গীতনৃত্য, আলাপের ভাষাবিলাস, হৃদয়ের প্রজাপ্রতিবৃত্তি ও অন্যান্য স্বাদু আনুষঙ্গিক নিয়ে যার রচনা। এবং এ-সমস্ত স্বাদবৈচিত্র্য বারো মাস এত বেশি পরিমাণে কলকাতার মত আর কোনোখানেই পাওয়া যায় না, এ তো সবাই জানে।

তিনটেই হয়-তো, কে জানে। মনের পাপ গোপন ক'রে লাভ নেই: স্বীকার করাই ভালো যে মাঝে-মাঝে ফুর্ত্তির একটু-আধটু ঝাপটা মন্দ লাগে না আমার—মানে, ভাবতে মন্দ লাগে না। কিন্তু সেই ভাবনা যদি কখনো বাস্তব রূপ ধরে, তাহ'লে দেখা যায় কল্পনার এই রসোপভোগ ঠিক যেন উৎরোচ্ছে না, যেন বিরক্তই লাগছে, যেন ঠেকছে অর্থহীন। এ একটা বস্তু যা নিয়ে ভাবতেই ভালো, ভাবনা অনুযায়ী তৈরি করতে গেলে সমস্তটা বিরস হ'য়ে ওঠবার আশঙ্কাই বেশি। জীবনের ফুর্ত্তির মুহূর্ত্তগুলো ফরমায়েস মানে না, নিজের খেয়ালে তাদের গতি। হাত বাড়িয়ে ধরা যায় না তাদের, তারা আসে।

কল্পনা ছেড়ে বাস্তবে এলে দেখা যাবে নাগরিক জীবনের এ-সমস্ত সঙ্গতি আমার পক্ষে কোনো আকর্ষণই নয়। আমার পক্ষে সহরের সব চেয়ে লোভনীয় যে-জায়গা সে হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলের কোনো গলির বিশেষ একটি বাড়ি—এবং সেই বাড়িরও বিশেষ একটি ঘর। সে-বাড়ি আমার এই অর্থে যে আমি তার ভাড়া দিই; সে-ঘর আমার এই অর্থে যে আমি সেখানে থাকি। সেই ঘরে কাটে আমার দিন-রাত্রির অধিকাংশ; ঘর থেকে যখন

বেরোই হয় অর্থাগমের নয় অর্থব্যয়ের উদ্দেশ্যে। দুটোই আবশ্যিক কর্ত্তব্য। সিনেমার প্রতি আমার অনাসক্তি ইতিপূর্বে বহুবার বহুভাবে প্রকাশ করেছি; এবং যেহেতু চার্লি চ্যাপলিন তিন বছরে একটার বেশি ছবি তৈরি করেন না, আমার সিনেমা-গমনও প্রায় সেই হারে এসে ঠেকেছে। এককালে থিয়েটার ভালোবাসতুম, কিন্তু শিশির ভাদুড়ীর (অন্যান্য থিয়েটারের কথা ধরছিইনে) কতগুলো 'নবতম অবদান' আশ্চর্য্য রকম 'কৃতকার্য্য' হ'য়ে সে-ভালোবাসা আমার মন থেকে ঠুকরে বা'র ক'রে দিয়েছে। বছর পাঁচেক আগে পরদার প্রতি যে বিতৃষ্ণা আমার প্রথম এসেছিলো, এখন সেই বিমুখতা এসেছে মঞ্চের প্রতি। জীবনে, দেখা গেলো, কোনো মোহই টেঁকে না: আগে আর পরে।

তা ছাড়া, আমি খেলা দেখিনে। কলকাতার অনেক লোকের পক্ষেই মস্ত আকর্ষণ এটা। কথাটা কে কী-ভাবে নেবেন জানিনে, কিন্তু সত্যি-সত্যি আমি ফুটবলের মাঠে একবারও যাইনি। এটা অপরাধ, সামাজিক বে-আদপি; সেইজন্যে সাফাইস্বরূপ এটুকু ব'লে রাখি যে আমার এই ক্রীড়াবৈরাগ্য আসলে বৈরাগ্য নয়, অক্ষমের হতাশা। আমার শরীর দুর্বল হ'লেও তাতে রক্ত আছে: এবং সে-রক্ত 'নিরীহ' ক্রীড়াচ্ছলে অপর ব্যক্তির রক্তপাতের সম্ভাবনায় নেচেও ওঠে। ফুটবলের উন্মাদনা ও উত্তেজনা সম্পূর্ণ বুঝি: যুদ্ধরূপ দুগ্ধের সাধ মেটাবার অতি উৎকৃষ্ট ঘোল এটি। রগ্‌বির মত খেলা—যাতে শুনতে পাই ইচ্ছাকৃত হত্যা ছাড়া সবই অনুমোদিত—সমস্ত পৃথিবীতে বহুল-ভাবে প্রচলন করতে পারলে কি যুদ্ধের অবসান করা যায় না? ছোকরারা রাগবি ফেলে যুদ্ধ করতে চাইবেই না—ঝক্‌ঝকে

পিতলের বোতাম-আঁটা সেনা-সজ্জার লোভেও নয়। যুদ্ধের সমস্ত উল্লাস ঐ খেলাতেই তারা পাবে, নর-হত্যার সামরিক অধিকার থেকেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে না। বিশেষ, যুদ্ধ ব্যাপারটা ক্রমশই এত বেশি বৈজ্ঞানিক ও নৈর্ব্যক্তিক হ'য়ে উঠবে যে পরবর্তী 'যুদ্ধ-শেষ-করা যুদ্ধে' প্রত্যক্ষভাবে খুন করার কি খুন হওয়ার রোমাঞ্চ একেবারেই থাকবে না। খুব ঠাণ্ডা মেজাজে একজন একটা কল টিপবে; দুশো মাইল দূরের একটা সহর যাবে গুঁড়ো হ'য়ে। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে চা খেতে ব'সে হঠাৎ একজন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে রক্ত-মাংসের কতগুলো ড্যালায় পরিণত হবে; কোন্ মহৎ উদ্দেশ্যে বীরের মত তারা প্রাণ দিলে, তা বোঝবারও সময় হবে না। যৌবনের অগ্নিময় রক্ত ও-ধরণের যুদ্ধে একফোঁটা মজাও পাবে না; প্রত্যক্ষভাবে ঢের বেশি উত্তেজক ও রক্তময় রগ্‌বিকেই আঁকড়ে থাকবে তারা। সত্যি বলতে, রগ্‌বি আন্তর্জাতিক শান্তির চমৎকার একটি ভিত্তি হ'তে পারে। উপযুক্ত কপিরাইট মূল্য পেলে প্রস্তাবটি দাখিল করতে পারি জেনিভায়।

উপরে যা বললাম তা থেকে এটা নিশ্চয়ই বোঝা যাবে যে আমি খেলা না-দেখলেও খেলার মর্ম বুঝি ভালো ক'রেই। এবং কখনো যে দেখি না, আমার শরীরের ভীরুতা ছাড়া তার আর কোনো কারণ নেই। অভিজ্ঞদের মুখে শুনে যতটা সংগ্রহ করতে পেরেছি, সেই সবুজ রণাঙ্গনে প্রবেশলাভ, অবস্থান ও সেখান থেকে নিষ্ক্রমণ সবই অমানুষিক ধৈর্য্য, সহনশক্তি এবং খানিকটা দৈহিক বল ও তৎপরতার অপেক্ষা রাখে। এক কথায়: সে-যুদ্ধ দেখতে যাওয়া মানে নিজে ছোটখাটো একটি যুদ্ধ করা। আর যে-কোনো অবস্থায়, যে-কোনো কারণে, শারীরিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে আমি পরম অনিচ্ছুক।

তাহ'লে একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে থাকাতেই যদি আমার সুখ, সে-ঘর কলকাতাতেই হোক, কি মাদারিপুর কি হবিগঞ্জেই হোক, তাতে কি কিছু এসে যায়? রাজধানীর মনীষার সঙ্গে যোগাযোগ—আমার পক্ষে সেটাই প্রধান আকর্ষণ নিশ্চয়ই? আলাপ, আলোচনা, চিন্তার বিনিময়, সমধর্মীর বাঞ্ছিত সংযোগ। দেশের সেরা লোকদের তো বেশির ভাগ কলকাতাতেই নিবাস; অন্তত, কলকাতায় থাকলে কখনো-না-কখনো তাঁরা অধিগম্য হনই। এটা মস্ত কথা সন্দেহ নেই; কথা ব'লে—ও কথা শুনে—সত্যি-সত্যি সুখ পাওয়া যায় এমন কয়েকটি মানুষের সঙ্গের জন্য অনেক কিছুই ছাড়া সহজ। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক সব সময় স্থাপিত হয় না—সব ব্যক্তিগত সম্পর্কে সুখও হয় না। এবং নিছক চিন্তার বিনিময়ই যদি উদ্দেশ্য হয়, সেটা পত্রযোগেও চলে, এবং পত্রযোগেই ভালো চলে। এমন কোনো অজ মফঃস্বল বঙ্গদেশেও নেই যেখানে কাছাকাছি একটা ডাকঘর না আছে; এবং আজকালকার দিনে ডাকঘরের কাছাকাছি থাকা মানেই পৃথিবীর কালচার-কেন্দ্রে থাকা। বই পাওয়া যায়, পাওয়া যায় সাময়িক পত্র, চিঠি লেখালেখি চলে। কলকাতায় থাকার উপরি লাভ তাহ'লে কী?

কিছুই না। নবীন বিলেতযাত্রী বাঙালি ছেলে এ-কথা ভেবে উল্লসিত হ'তে পারে যে হাইড পার্কে পা দিয়েই সে দেখতে পাবে বুড়ো বর্নার্ড শ চলেছে ঘোড়ায় চ'ড়ে হাওয়া খেতে, এবং বাস্‌এ উঠেই পাশে বসবে এক্কেবারে চেস্‌টারটন সাহেবের: কিন্তু আসল ব্যাপারটা অবিশ্যি ঠিক সে-রকম নয়। 'দেশের সেরা লোকদের' সঙ্গে দেখাশোনার সুযোগ অল্পই মেলে (যদি না ইংরেজরা থাকে বলে সিংহ-শিকারী, তা-ই হওয়া যায়); এবং

সেরা লোকরা সকলেই যে সব সময় পরিচয়ের খুব যোগ্য হন তা-ও নয়। আমার কথা এই যে লোকজনের সঙ্গে চেনাশোনার যত সুযোগ আমি পেয়েছিলাম সব নিতান্ত নিশ্চিন্ত ও চিন্তাহীন ভাবে অপব্যয় করেছি : এখন আমি কাউকেই প্রায় চিনি শুনি না ; এমন কি, এককালে যাদের চিনতাম তারাও এখন প্রায় না-চেনার মধ্যে। এ-রকম হয়েছে আমার স্বভাবেরই দোষে ; আমার মনের সঙ্কোচ ও শরীরের আলস্যই এ-জন্য দায়ী। বাড়ি থেকে বেরোতেই আমি অনিচ্ছুক ; বাড়িতে ব'সে ভালো না-লাগলেও বাইরে গিয়ে খুসি হওয়ার চেষ্টা করা আমার উৎসাহে যেন কুলিয়ে ওঠে না। আমার বন্ধুর গণ্ডী তাই অতি, অতিশয় সঙ্কীর্ণ : কলকাতায় এমন লোক পাঁচজনের বেশি নেই, যাদের সঙ্গে আমি সত্যি-সত্যি মন খুলে কথা কইতে পারি। এবং তারা মহৎ লোক নয়, অন্তত, আমার চেয়ে বেশি মহৎ নয়। সে-বিষয়ে আমি একটু দৃষ্টিই রাখি, যাতে আমার চাইতে একেবারে অনেক মস্ত বড় কারো সঙ্গে আমার বেশি সাহচর্য্য না হয়। কেননা সেরকম কোনো লোকের সংসর্গে এলে কেবল কথা শুনেই যেতে হয়, এবং কেবল শোনাকে আলাপ বলে না। তা ছাড়া, সেকথা যতই বুদ্ধিদীপ্ত, যতই গম্ভীরচিন্তাপ্রসূত, যতই সূক্ষ্ম-সরস হোক, খানিক পরে ক্লান্ত লাগতে আরম্ভ করেই। আর তা ছাড়া, কথা বলায় আমি খুব নিপুণ না হ'তে পারি, তবু মাঝে-মাঝে আমারও কথা কইতে ইচ্ছে করে।

সুতরাং কালচার-কল্পতরুর আশ্রয় কি সুজন-সঙ্গের আনন্দ—, কলকাতার গোপন রহস্য এর কোনোটাই নয়। তাহ'লে কি বৈষয়িক আকাঙ্ক্ষাই রয়েছে আমার কলকাতা-আসক্তির মূলে ? এ-সন্দেহ অগ্রাহ্য হবে এই বললেই যে সে-রকম কোনো

আকাঙ্ক্ষা আমার মনে যদি বা থাকে, তা পূর্ণ হবার কোনো-রকম সম্ভাবনাই নেই। আমি তা জানি। মনের ইতর ইচ্ছা-গুলো স্বীকার ক'রে ফেলাই ভালো : নিশ্চিত ও প্রচুর আয়ের আরাম কেদারায় ব'সে মনের সুখে চটি-খোলা পায়ে পা বুলোতে আমার খুবই ইচ্ছা করে কখনো-কখনো। ইচ্ছে করে নিজের গাড়িতে চড়ি, ইচ্ছে করে এমন পাড়ায় এমন বাড়িতে থাকি যেখানে চুপচাপ একা থাকতে চাইলে বাইরের কি ভিতরের কোনোরকম বাধা হবে না, ইচ্ছে করে…অনেক কিছুই। তবে এ-সব ইচ্ছা আলানাস্করি স্তরে পৌঁছতে পারে না এই কারণে যে দিবাস্বপ্নের অন্যান্য (এবং এর চেয়ে উৎকৃষ্ট—কেননা বেশি টেঁকসই) উপকরণ আছে আমার। এবং যেহেতু আমি বাঙলাদেশে লিখ্‌নেওয়ালা হ'য়ে জন্মেছি, এ-সব ইচ্ছা আমার মধ্যে শুধু কলিকের ব্যথার মত মাঝে-মাঝে মুচড়িয়ে উঠবে—তার বেশি কিছুই কোনোদিন হবে না—এ আমি ভালো ক'রেই জানি। কবিদের দারিদ্র্যের প্রবাদ সব দেশেই : এ-দেশে অতি মারাত্মকরকম সত্য। এবং সব দেশেই কবিরা উচ্চতর জীবনের দোহাই দিয়ে নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েছেন, গোপন করেছেন ঈর্ষা।

এসো বন্ধু, তাদের করুণা করি, আমাদের চেয়ে যারা সঙ্গতিবান।
বন্ধু, এ-কথা মনে রেখো
ধনীর বাবুর্চি-খানসামা আছে, বন্ধু নেই,
আর আমাদের আছে বন্ধু, নেই বাবুর্চি-খানসামা।
এসো বিবাহিতকে করুণা করি
করুণা করি অবিবাহিতকে।

ঘরে ভোর আসে ছোট্ট পা ফেলে
পাভলোভার প্রতিমার মত,
বাসনা আসন্ন আমার।
আর এই যে স্বচ্ছ শীতল মুহূর্ত্ত
একসঙ্গে ঘুম ভাঙার এই যে মুহূর্ত্ত
জীবনে এর চেয়ে ভালো কিছু নেই।

এজরা পাউণ্ডের রচনা থেকে এ-দৃষ্টান্তটা মনে পড়লো (পাউণ্ড-ভক্তরা এই শিথিল তর্জমা মার্জনা করবেন)। এই আত্ম-সান্ত্বনা যে একেবারেই অমূলক এমন নয় ; এ-জীবন সত্যিই উঁচু স্তরের।

যা-ই হোক, যে-কারণে এত সব স্পষ্ট অস্থবিধে সত্ত্বেও কলকাতাকে আমি ভালোবাসি, সেটা ধনী হবার আশা নয়। বস্তুত সে-আশা মনে স্থান দেবারই উপায় নেই আমার। হতাম যদি দালাল কি দোকানদার কি পাঠ্যকেতাব-লিখিয়ে তাহ'লে কলকাতাকে একটা খনি মনে করতে পারতাম বটে, যেখান থেকে বুদ্ধির কুড়োল মেরে-মেরে সোনা তুলে আনলেই হ'লো। আমার ফাউণ্টেন পেনের তাড়নায় যদি নেকড়ে বাঘ দরজার বাইরে থাকে তাহ'লেই যথেষ্ট।

সত্যি, কেন তবে এই কলকাতার মোহ ? কোনো কারণ নেই। বরঞ্চ যা-কিছু আমি ঘোরতর অপছন্দ করি, সবই এই সহরেরই আনুষঙ্গিক। এখানে ভিড়। এখানে ধূলো। এখানে গোলমাল। স্তব্ধতা নেই, নেই অন্ধকার। এখানে গণ-মনের সংঘবদ্ধ উন্মত্ততা। এখানে পৃথিবী অতি কৃপণ : কি গৃহে কি যানে কি কর্ম্মস্থলে, হাত-পা নাড়বার জায়গা নেই কোনোখানেই।

সবই ঘোরতর অপছন্দ করি, তবু কলকাতাকে ভালোবাসি, এ-সমস্ত উপদ্রব ছাড়িয়ে কোন্‌খানে যেন আছে কলকাতার এক বিশাল, অন্ধকার আত্মা, তার আকর্ষণ আমার রক্তে। এ একটা মোহ, তা ছাড়া আর কী বলবো? মোহ কখনো যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। পুরুষ যখন মেয়েকে ভালোবাসে, তার কি কোনো কারণ থাকে? সেটা মোহ—খুব ভালো অর্থে। জীবনকে লালন করবার যত কৌশল আছে প্রকৃতির, তার মধ্যে মোহই তো শ্রেষ্ঠ। মনে নেশা ধরায়—আর জীবনের যতখানি আমরা নেশার অবস্থায় কাটাতে পারি, ততখানিই সার্থক। আমি অনেক মোহের মানুষ, স্বভাবতই আমি মাতাল। সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ অবস্থা আমার পক্ষে মৃত্যুর মত। কবে একদিন কলকাতার মোহ লেগেছিলো আমার মনে; এখনো ট্র্যামে যেতে-যেতে বাইরে তাকিয়ে হঠাৎ যেন লাগে বিস্ময়ের ধাক্কা। কলকাতার সেই অন্ধকার রহস্যের সত্তা—এই সমস্ত দৃশ্য আর শব্দ তারই প্রকাশ, তবু তা সমস্ত দৃশ্য-শব্দের অতীত—হঠাৎ-ঝলকে কখনো-কখনো তা ধরা পড়ে। সব চেয়ে বেশি ধরা পড়ে কিছুদিন বাইরে কাটাবার পর ভোরবেলা হাওড়া কি শেয়ালদয় এসে পৌঁছলে। এইমাত্র-জল-দেয়া কালো চিকচিকে রাস্তা থেকে যে-একটি অদ্ভুত গন্ধ উঠে আসে, তা যেন পুরোনোকালের স্মৃতির মতই প্রিয়—সময়ের হাতও কোনোদিন তাকে ছুঁতে পারবে না। মুহূর্তে কথা ক'য়ে ওঠে বুকের মধ্যে সহরের অন্ধকার, চিরন্তন আত্মা।

৩

রেলগাড়িতে চড়া এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার। হঠাৎ এক পৃথিবী থেকে আর-এক পৃথিবীতে আমরা বদলি হ'য়ে যাই। যেন আলাদিনের কোনো জিন ঘুমের মধ্যে আমাদের তুলে নিয়ে যায় প্রাত্যহিক ও অভ্যস্ত আবেষ্টনী থেকে কোনো আশ্চর্য্য নতুনে। অবাক হ'য়ে যাই চোখ মেলে।

আজকাল প্রায় সব ভালো গাড়ি রাত্রিতে চলে; এ-রকম মনে হওয়ার আরো বেশি কারণ সেইজন্যে। সত্যি-সত্যি ঘুমের মধ্যে আমরা চ'লে যাই প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে, নরম থেকে শক্ত মাটিতে, ভিজে থেকে শুকনো হাওয়ায়। এ তো পথ চলা নয়, এ হচ্ছে চালান হওয়া। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা আপত্তি এই হ'তে পারে যে উপায়টা বড় বেশি সহজ। কথাটা পুরোনো। যদি অভিজ্ঞতা থেকে কোনো সার্থকতা চাই-ই, তার অর্জন হবে দুঃখসাপেক্ষ। যার জন্যে কষ্ট করতে হ'লো না, তাকে বেশি মূল্য না-দেয়াটা মানুষের স্বভাব। যে-সময়ে রোমে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না, সে-সময়ে ক্যাথলিক পুণ্যপিপাসুরা কেবল পায়ে হাঁটাতেই খুসি না-থেকে জুতোর মধ্যে পাথরের কুচি ঢুকিয়ে নিয়ে পুণ্যের ওজন বাড়াতেন। আমাদের দেশেও তীর্থপর্য্যটন এত বড় মহৎ পুণ্য ছিলো এই কারণেই যে অমানুষিক ক্লেশ ছাড়া তা সম্ভব হ'তো না। প্রাণনাশের আশঙ্কা ছিলো প্রতি পদে। রেলকোম্পানি এসে তীর্থযাত্রা

সুসাধ্য করেছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে—এবং সেই কারণেই—তীর্থমাহাত্ম্যও অনেক কমিয়ে দিয়েছে।

দ্রুত ও সুলভ যানের এই দিনে পদপর্য্যটনা সম্বন্ধে রোমান্টিক কল্পনা সহজেই উদ্দীপিত হয়। প্রথম কথা, ভ্রমণের ক্লেশেই গন্তব্য মহিমান্বিত হয়। কষ্ট ক'রে যেখানে পৌঁছতে হয় সেটাই তীর্থ। যেমন কিনা, লেখার উপর চলনসই রকমের দখলও অনেক কষ্টেই আসে, সুতরাং সে-অবস্থায় পৌঁছতে পারা নিঃসন্দেহ পুণ্য। যন্ত্রের জিন দূর করেছে শরীরের ক্লেশ, কিন্তু সাধনার দুঃখ মানুষের চিরন্তন। মনের সাধনা সব মানুষের জন্য নয়; সাধারণ মানুষের জন্য শরীরের এই ক্লেশ বোধ হয় ভালোই ছিলো। তাতে ছিলো মুক্তি। যে-পরিব্রাজক শীতে অনশনে পরিশ্রমে দীর্ঘপথ কাটিয়ে শেষ পর্য্যন্ত একদিন দূর থেকে দেখতে পেতো রোমের কি কাশীধামের উজ্জ্বল আভাস, তার জীবনের সেই এক মুহূর্ত্তের পরম রোমাঞ্চ অতি মহার্ঘ জিনিস।

লৌকিক ধর্মের পতন এ-যুগের একটা বিশেষ ঘটনা। তাতে আমরা অনেক ঘোর অমঙ্গল থেকে রেহাই পেয়েছি; কিন্তু লোকসানও বোধ হয় কিছু হয়েছে। এতকাল ধর্মে ছিলো মানু-ষের মনের নিষ্ক্রমণ; তার জীবনটাকে একটা সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট ছন্দে বেঁধে দেয়া হ'তো নানা আচারে নানা অনুষ্ঠানে, উৎসবে ও উপবাসে। সে-ছন্দ কেড়ে নিয়েছে আধুনিক কাল, কিন্তু তার বদলে কিছু কি দিতে পেরেছে? নেহাৎ আনুষ্ঠানিক ধর্মেরও এটুকু সার্থকতা ছিলো যে তা মানুষের জীবনকে ব্যবহারিক সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে বের ক'রে নিয়ে আসতো বিশ্বসৃষ্টির পট-ভূমিকায়। আর আজকালকার মানুষের জীবন কী? একজন ইংরেজ বলেছেন: ধর্মের আর প্রয়োজন নেই আজকাল, তার

বদলে আর্ট আছে। কিন্তু আর্ট তো সকলের জন্যে নয়। সাধারণের জন্য আছে সিনেমা আর রেডিয়ো আর খবরের কাগজ, পলিটিক্স আর ক্রস্‌ওয়ার্ড আর অসংখ্য কলে-চলা আমোদ, যাতে ব্যক্তির স্ফূর্তি নেই, আছে সঙ্ঘবদ্ধ উন্মত্ততা। সমুদ্রের বীচে প্রায়-উলঙ্গ অবস্থায় (ঐ প্রায়টাই অশ্লীল) হাজার স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত মাংসপিণ্ডে চটকে যাওয়ার চাইতে গির্জার নির্জন অন্ধকারে প্রতিমার সামনে মোমবাতি জ্বালানো সত্যিই অনেক পুণ্যময় কাজ। এ-কথা মানতেই হবে যে গ্রিটা গার্বোকে দেবী ক'রে তোলার চাইতে শ্রীরাধার দেবীত্বে বিশ্বাস করায় সাধারণ বুদ্ধির পরিচয় অন্তত বেশি।

আধুনিক জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজিডি এই যে ফুর্তিটাও ফরমায়েসি। মানুষের সুখদুঃখের উপকরণ থাকে তার নিজেরই মধ্যে, সেটা একটা স্বাভাবিক ক্ষরণ। কিন্তু আজকালকার মানুষ সুখের কারখানার দাস, সেখান থেকে আসে বিচিত্র লেবেল-আঁটা রঙবেরঙের টাটকা আমোদ—পয়সা দিয়ে কিনতে হয় ব'লেই সন্দেহ থাকে না যে ফুর্তি হ'লো। অন্য সব কিছুর মত ভ্রমণেও তা-ই হয়েছে। ভ্রমণ ক'রে প্রায়ই আমরা রেল-কোম্পানির বিজ্ঞাপন সার্থক করি মাত্র। বেরিয়ে পড়ি ছক-কাটা রাস্তায়; বিজ্ঞাপনের ভাষার বহর অনুসারে চেষ্টা করি উপভোগ চাড়িয়ে তুলতে। বিজ্ঞাপনের অতি সূক্ষ্ম প্রভাবের অধীন আমরা সবাই, সবাই। আমরা যাই 'বিখ্যাত' জায়গায়, যাই সেখানে, যেখানে অন্য সবাই যায়। ছুটিতে বেড়ানোর প্রধান আকর্ষণ যে নিরিবিলি চুপচাপ কয়েকটা দিন কাটানো, এ-কথা তাদের দেখে মনেই হয় না যারা গরম পড়তেই সদলবলে দারজিলিঙ সহরে যায় ফ্যাশানের পুরোদস্তুর কুচকাওয়াজ নিয়ে।

মাঝে-মাঝে, তাই, পুরোনো দিনের জন্য মন-কেমন করে। এটা অনিবার্য্য। গণ-মতের চাপে যাদের মন একেবারে নির্মূল হয়ে যায়নি, এমন কিছু-কিছু লোক প্রতিযুগেই থাকবে। এবং তাদের কাছে বর্তমানকে হ'তেই হবে অতৃপ্তিকর: তারা ভবিষ্যৎকে নিজের বাসনার রঙে সাজাবে, কি অতীতের কোনো যুগকে নিজের কল্পনায় নতুন সৃষ্টি ক'রে নেবে। কোনো-এক কাল্পনিক সময় হবে তাদের মানসজগৎ, সেখানে তাদের ইচ্ছা-পূরণ। কাল্পনিক ইচ্ছে ক'রে বলছি, কেননা এ-সব অতৃপ্ত মন যে অতীতের কোনো যুগকে আশ্রয় করে, সে-অতীত তো ইতিহাসের পাতা নয়, সে কবিতা, কল্পনার তাপে গলানো সে, ভাবের ছাঁচে গড়া। উইলিয়ম মরিসের মধ্যযুগ অবিশ্যি ইতিহাসের মধ্যযুগ নয়; কালিদাসের কাল রবীন্দ্রনাথেরই, কালিদাসের খুব সম্ভবত নয়।

তেমনি আমারও মাঝে-মাঝে মনে হয়, পরিব্রাজনা আর গোযানের দিনে আসলে কত বেশি সুখী ছিলো মানুষ! রোমাঞ্চ ছিলো, উন্মাদনা ছিলো; তা ছাড়া ছিলো প্রকৃত পর্য্যবেক্ষণের অপরিসীম সুযোগ। আমাদের মন ধনী হয় অভিজ্ঞতার পরিমাণ অনুসারে নয়, নিবিড়তা অনুসারে; আর দশ মাইল পায়ে হাঁটায় আমরা যা দেখবার, যা অনুভব ও গ্রহণ করবার সুযোগ পাই, তা কি পাওয়া যায় রেলগাড়িতে রাতারাতি একটা আস্ত দেশ পার হ'য়ে? সেই তো সত্যিকারের পথ চলা, যখন পথের দু' ধারে কত-কিছু থেকে-থেকে ডাক দেয়—এখানে একটা অদ্ভুত চেহারার গাছ, ঐ হলদে পাখিটা উড়ে গেলো, একটা কুকুর ছায়ায় শুয়ে হাড় চিবোচ্ছে হয়তো। কিছু ফেলবার নয়, সবই ভালো লাগে। সেই তো প্রকৃত অবসর, যখন পৌঁছবার তাড়া নেই, লক্ষ্যটা হ'য়ে উঠলো উপলক্ষ্য, পথ চলা হ'লো

আপনাতে আপনি সার্থক। সেই তো আলস্য, সেই তো উপভোগ। "What is life if full of care, we have no time to stand and stare?"

এখানে, সহরে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকাটা শুধু বেয়াদবি নয়, প্রায় বে-আইনি। শুধু তা-ই নয়, তাতে শারীরিক বিপদেরও আশঙ্কা আছে। সহরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যারা তাকিয়ে থাকে, নিতান্তই তারা রাস্তার লোক। তারা ভিড়। এ-সংস্কার আমাদের মনে এমনি মজ্জাগত যে রাস্তায় যখনই বেরুই, ব্যস্ত না-হ'লেও ব্যস্ত হবার ভাণ অন্তত করতে হয়। নয়তো নিজেরই কাছে মানহানি হয় যেন। অথচ এই কলকাতারই পথে-পথে অকারণে ঘুরে বেড়াবার আনন্দই কি কম! ভবানীপুরের বিশেষ একটা রাস্তা আছে, যাতে সন্ধের পর ম্লান গ্যাসের আলোয় ঢুকতেই আমার কেমন অদ্ভুত লাগে। কিন্তু কদাচ যাওয়া হয় সেখানে, কেননা যাওয়ার কোনো "কারণ" নেই। এমনি অলক্ষিত ও অলঙ্ঘনীয় সংস্কারের বন্ধন।

সহর ছেড়ে পালাবার জন্য এক-এক সময় মনটা যে ছটফট ক'রে ওঠে তা তো এই স্বাধীনতারই টানে, নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়াবার ও অকারণ তাকিয়ে থাকবার এই অধিকারের লোভে। এখানে যখনই বাড়ি থেকে বেরোই, হয় কাজে কি ভোজে, অর্থের কি আমোদের সন্ধানে, ব্যবসার খাতিরে কি নিমন্ত্রণরক্ষায়। সাজসজ্জা, আচার-ব্যবহার, কথার কায়দা, কত কী! বাইরে, এ-সমস্তর কোনো বালাই নেই। বেরিয়ে পড়লাম যখন খুসি যে-কোনো রাস্তা ধ'রে, রাস্তা ছেড়ে মাঠে, মাঠ ছেড়ে বনে, পৌঁছতে হবে না কোনোখানে, ফেরবার তাড়া

নেই—গায়ের জামাটায় ভব্যতার কড়া ইস্ত্রি না-থাকলেও বেরুনো আটকাবে না, এমনকি। নিজের পরিবেষ ছেড়ে পালাবার প্রধান আনন্দ এই স্বাধীনতা। করুণা করতে হয় তাদের যারা ছুটির দিনেও কলকাতার "দল" ও কলকাতার ব্যবহার বাইরে টেনে নিয়ে যায়; আর দয়া করতে হয় সেই মাতব্বরদের যারা যেখানেই যায় ঘেরাও হয়ে থাকে সাজগোজ লোকলস্কর এনগেজমেণ্টের ভিড়ে।

তবু এটাও ঠিক যে পায়ে হেঁটে দেশ-ভ্রমণ ভাবতে যতই রোমাঞ্চকর হোক্, আমার জীবনে তা ভাবনার আকাশে রঙিন মেঘ হ'য়েই থেকে যাবে। সব চেয়ে বড় বাধা হচ্ছে শারীরিক ক্লেশ। ভেবে দেখছি আজকালকার মানুষের মানসিক দুঃখ-ভোগের এত বিচিত্র উপায় আছে, যে স্বর্গের দরবারে দাবি পাকা করবার আশায় ইচ্ছে ক'রে শরীরের কষ্ট নিয়ে লাভ নেই। তার উপর, আমার যেমন শরীর তার কষ্ট করবার ক্ষমতা অত্যন্ত কম। কোনো রোমাঞ্চের প্রলোভনেই আমি নৌকোয় কি সাইকেলে পৃথিবী-ভ্রমণ করতে রাজি হবো না। শরীরটাকে যথাসম্ভব শান্তিতে রেখে উদ্দাম আকাশে মানসযাত্রা আমার চরম অ্যাডভেঞ্চার।

এ-সমস্ত ছাড়াও আরো একটা মস্ত কারণ আছে যার জন্যে রেলগাড়ির যুগ থেকে পায়ে হাঁটার যুগে বদ্‌লি হ'তে আমি নারাজ। রেলগাড়ি জিনিসটাই ভারি আশ্চর্য্য। বেগের আনন্দ আধুনিক মনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, সে-কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু রেলগাড়ি যে-অদ্ভুত অভিজ্ঞতার যোগান দেয় পদাতিক ভ্রমণে সেটা সম্ভব নয়, অন্য কোনো যানেই সেটা সম্ভব নয়। রেলগাড়ি শুধু আমাদের এক ইষ্টিশান থেকে আর এক

ইষ্টিশানেই নিয়ে যায় না, বাস্তব থেকে রূপকথার জগতেও নিয়ে যায়। রাত্রির ভিতর দিয়ে দ্রুত ধাবমান গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে এই বাস্তব পৃথিবীকে আর চিনতে পারিনে, প্রতি মুহূর্তে রূপকথার এক-একটি পাতা খুলে যাচ্ছে। সবই অদ্ভুত। বাড়ি-আর কলকারখানা, সহর আর মাঠ ঝোপ জঙ্গল, এমনকি পশু পাখি মানুষ—সবই অদ্ভুত, সবই ক্ষণিক, কিছুরই অবয়ব স্পষ্ট নয়, সবই ছায়াময়, সবই ছায়া-স্নানে আজানুমগ্ন, সবই বাঁকা-চোরা, যেন শেষ-না-হওয়া ; যেন এই সৃষ্টি বিধাতার কল্পনার সমুদ্র থেকে জেগে উঠেছে এইমাত্র। একটা কথা আছে যে বিশ্বসৃষ্টি স্থবির নয়, সাবলীল ; এই আপাতস্তব্ধতার আড়ালে ব'য়ে চলেছে একটি চিরকালের প্রাণস্রোত : জড়বস্তুর সেই তীব্র তির্য্যক গতিস্রোত রেলগাড়ির জানলায় ব'সে হঠাৎ-আভাসে ধরা পড়ে যেন। সেখানে ব'সেই দেখা যায় গাছগুলো ঝাঁকে-ঝাঁকে ছুটে চলেছে, পাহাড় পাখা মেলে উড়ে চ'লে গেলো, দিগন্ত কতবার ঘুরে-ঘুরে গেলো পাখির ঝাঁকের মত। হয়তো অন্ধকার, হয়তো অস্পষ্ট জ্যোছনা ; আলোর কয়েকটা ফুটকি চোখের উপর দিয়ে ঝিলকিয়ে গেলো, একটা ষ্টেশন ; কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, হঠাৎ চোখ মেলে দেখি বড় ইষ্টিশানে গাড়ি লেগেছে।—ঘুমে ভরা চোখে ছায়ামূর্ত্তির মত মানুষগুলি, শব্দ-গুলি যেন স্বপ্নে শোনা—কিম্বা দেখি গাড়ি সাঁকো পার হচ্ছে মৃদুবেগে, নিচে বালুর বিছানায় ম্লান জ্যোছনার ঝিকিমিকি, মাঝখান দিয়ে অতি সরু একটি জলস্রোত চলেছে সরু সাপের মত একেবেঁকে, দূরে একটা পাহাড়। আবার ঘুমিয়ে পড়লুম ; তারপর ভোরবেলা যেখানে নামলুম, সেখানে এ কী বিচিত্র সুন্দর পৃথিবী। আগের রাত্রে যে-কলকাতাকে ছেড়ে এসেছি,

এই কয়েক ঘণ্টাতেই তাকে গেছি ভুলে। সে যেন বিস্মৃতির কুয়াশায় লিপ্ত ; সে যে কোনোদিন ছিলো তাও যেন আর ভালো ক'রে মনে করতে পারিনে।

এটা উপলব্ধি করেছিলুম সেদিন, যেদিন পুরী যাওয়ার পথে নামলুম ভুবনেশ্বরে। তখন ভোর। কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত চাঁদের জ্যোছনা ছিলো প্রায় সমস্ত পথ, এখনো লেগে রয়েছে তার ভূতুড়ে আভাস। চারদিক অদ্ভুত চুপচাপ ; আলো-জ্বালা জানলাগুলো নিয়ে লম্বা রেলগাড়িটা ছবির মত দাঁড়িয়ে, শুধু দূরে শোনা যাচ্ছে এঞ্জিনের অসহিষ্ণু নিঃশ্বাস। কী অর্থহীন হ'য়ে যায় রেলগাড়ি, যে-মুহূর্ত্তে আমরা তা থেকে নামি! কী নিরর্থক মনে হয় যাত্রীদের, যেমন-তেমন শুয়ে ব'সে ঝিমুচ্ছে! গেলো গাড়ি ছেড়ে, সমস্ত জনপদ হঠাৎ বিরহী গৃহের মত খাঁ-খাঁ ক'রে উঠলো। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সব ডুবলো নতুন দেশের নতুন দৃশ্যে। প্ল্যাটফরমের অন্য দিকে দিনের আলো ফুটেছে, কত মাঠ কত গাছ কত আকাশ। আকাশে দপ্‌দপ্‌ ক'রে একটা তারা জ্বলছে, ঐ তো সবুজ পাহাড়। পাণ্ডাজি এগিয়ে এলেন, শরণ নিলুন। নিলুম গোরুর গাড়ি, এখন পর্য্যন্ত উড়িষ্যার প্রধান যান। উঠলো বাক্স-বিছানা, আমরা উঠলুম। জ্যোছনার শেষ ছায়া মিলিয়ে গেছে ততক্ষণে, ভোর হ'লো। লাল মাটির রাস্তা দিয়ে অতি আস্তে আমরা চলেছি। গাড়ির চাকা কঁকাচ্ছে। আমাদের নাকে খড়ের আর গোরুর গায়ের আর শিশিরে-ভেজা সকাল বেলার গন্ধ। পথের দু'ধারে পাখির ডাক, ঘন গাছের সারি। দেখতে-দেখতে রোদ ফুটলো, আমা-পথে আলো-ছায়ার জাল বোনা ; আমাদের কানে গাড়ির চাকার গোঙানি আর পাখির ডাক। একটু পরেই দেখা পেলাম হাজার

মন্দিরের দেশে প্রথম মন্দিরের। দু' একজন বাঙালি বৃদ্ধ বেড়াচ্ছেন, অতিরিক্ত শীতবস্ত্রে মোড়া; ছোট-ছোট বাড়ি; লোকালয় কাছে। তারপর রাস্তাটা হঠাৎ একটা সরু বাঁক নিয়ে নেমে গেছে, গড়গড়িয়ে গাড়ি চললো, তারপর আর-একটা বাঁক পার হ'য়ে বিশাল কালো দিঘি কূলে-কূলে ভরা, ওপারে ভুবনে-শ্বরের বিশাল পরিষ্কার মন্দির ভোরের আকাশে উঠে গেছে, এপাশে ধরমশালা।

৪

আমাদের কপালগুণে সেদিনই বৃষ্টি এলো। কনকনে হাওয়ায় উত্তরের শান, আর ঠাণ্ডা পাৎলা বৃষ্টি। সুতরাং ধরমশালার ছোট ঘরে ব'সে-ব'সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকানো, আর মাঝে-মাঝে ছোট স্পিরিট ষ্টোভে আধ ঘণ্টায় জল ফুটিয়ে চা-পান—এ ছাড়া কিছুই আর করবার রইলো না। দিঘির বুকের উপর বৃষ্টি যেন কুয়াশার পরদা, ঝাপসা মাঠ বন গাছ-পালা চারদিকে। কেমন একটা ফ্যাকাশে হলদে রঙের আকাশ, আর থেকে-থেকে ঝাপটা আসে আর হঠাৎ থেমে যায়। কুণ্ডে যাওয়া হ'লো না, দিঘিতে স্নান সেরে নিলুম। পাণ্ডাজি নিয়ে এলেন মন্দিরের প্রসাদ—তার চেয়ে ভালো খাদ্য ভুবনেশ্বরে দুষ্প্রাপ্য। এ-দেশের জলের গুণে তীব্র ক্ষুধাবোধ হয়, কিন্তু খাদ্য সে-অনুযায়ী পাওয়া যায় না। আমিষভোজী বাঙালির পক্ষে, বিশেষ ক'রে, দু'দিনেই প্রায় অনশনে এসে ঠেকে, যদি আশ্রয় হয় ধরমশালা। এই পান্থনিবাসগুলিতে অবিশ্যি আমিষ-প্রবেশ নিষিদ্ধ। কোটিপতি মাড়োয়ারিদের দান এগুলি। ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থস্থানে মাড়বসন্তানের পুণ্যক্রয়ের এমনি কত দলিল! সমস্ত দেশের খাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে জেনে-শুনে যে পাপ এঁরা করেন, তারই ক্ষতিপূরণ হয় ধরমশালা নির্মাণে, মন্দিরে-মন্দিরে মহার্ঘ উপঢৌকনে। অন্ধ বিশ্বাসের মস্ত একটা সুবিধে এই যে বিবেক অতি সহজেই পরিষ্কার রাখা যায়। এঁরা

বিনা দ্বিধাতেই বিশ্বাস করেন যে প্রেম ও যুদ্ধের মত বাণিজ্যেও কিছুই অন্যায় নয়, কেননা মুনফার একটা অংশ তো দেয়া হয় দেবতাকেই। ও-সমস্ত উপায় অবলম্বন না-করলে দেবতার এ-পাওনা হ'তো না, সুতরাং চিনিতে বালি মেশাবার উদ্যমেও দেবতাই সহায়।

যা-ই হোক্, তখনকার মত মাড়োয়ারির পুণ্যলোভকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারিনি। এখানকার ধরমশালার আশ্রয় অনুদার নয়। ঘরের দরজা বন্ধ করলেই নিশ্চিন্ত। জানলার বাইরে মাঠের পর মাঠ গাছে-গাছে সবুজ হ'য়ে দিগন্তে মিশেছে, এই মাটির ঢেউ-খেলানো সমুদ্রে চোখ কোথাও বাধা পায় না। উড়িষ্যা ঘন পল্লবের দেশ। সাঁওতাল পরগণার পাহাড় কঠিন নীল পাথরের স্তূপ, একটি ঘাস জন্মায় না। উড়িষ্যার পাহাড় নিবিড় সবুজে মোড়া। সে-সবুজ প্রায় কালো। বাঙলার হৃদয়ের ভাষা যেমন নদী, এখানকার প্রকৃতি তেমনি অজস্র জঙ্গলে কথা ক'য়ে উঠেছে। সন্ধ্যা নামলো, আবার বৃষ্টি এলো। ঘরে লণ্ঠনের আলো দেয়ালে অদ্ভুত ছায়া ফেলেছে, বাইরে থমথমে অন্ধকার। দূরে বুঝি দেখা যায় একটা আলোর ফুটকি, হঠাৎ শোনা যায় কে যেন চীৎকার ক'রে কাকে ডাকছে অন্ধকারে। সন্ধ্যা হ'তে-হ'তেই মধ্যরাত্রি। একটা অস্পষ্ট আতঙ্কে মন ভ'রে যায়। অনেকরাত্রে বুঝি চাঁদ উঠলো; মেঘ চুঁইয়ে পড়লো আবছা জ্যোছনা। সেই মৃত্যু-ম্লান জ্যোছনায় নিঃসীম জনহীন প্রান্তর কঙ্কালের মত ফুটে উঠলো; মনে হ'লো পৃথিবীর হাড়-গোড় যেন দেখা যাচ্ছে।

পরের দিন প্রকৃতি প্রসন্ন হ'লো। হেসে উঠলো আকাশ, শিরশিরে হাওয়ায় দিঘির জলে ছোট-ছোট ঢেউ উঠছে, ঢেউ

উঠছে আমাদের মনে—এমন নীল আকাশ, আর এমন সোনার রোদ, আর পায়ের নিচে মাটির স্পর্শ এমন মধুর। কেননা কুণ্ডে স্নান করতে যাবার পথে পায়ে আমাদের জুতো ছিলো না। আঁকা-বাঁকা সরু পথের দু'ধারে কত মন্দিরের ভাঙা-ভাঙা স্তূপ, মাঝখানে ছোট্ট ঝরনা ছলছলিয়ে চ'লে গেছে—কী ঠাণ্ডা জল—আর আকাশের পরে আকাশ ছড়ানো, শেষ নেই। কুণ্ডের ধারে মন্দির, স্নানের পর সেখানেই সে-বেলার অন্ন জুটলো। গাছের ছায়ায় সবুজ শ্যাওলার উপর ব'সে খাওয়াটা রোমান্টিক খুবই, তবে সে-খাওয়া যদি কাঁকর-মেশানো মোটা ভাতের সঙ্গে অখাদ্য একটা ব্যঞ্জন আর ভাতের মতই মোটা দানার নুনে পর্য্যবসিত হয় তাহ'লে রোমান্টিক রস অনেকটা ফিকে হ'য়ে আসে এ-কথা বলবোই। তার উপর ঐ দুধকুণ্ডের জল খেলেই খিদেটা নিতান্ত অসভ্যের মত চাড়িয়ে ওঠে।

ভুবনেশ্বর মন্দিরের দেশ। ওটুকু জায়গা ভবানীপুরে তুলে আনলে যতগুলো পানের দোকান পাওয়া যাবে, ঠিক ততটাই বোধ হয় মন্দির ভুবনেশ্বরে ভাঙা আস্ত ছোট বড় মিলিয়ে। এক পা বাড়ালেই কোনো-না-কোনো ধ্বংসস্তূপের উপর হোঁচট খেতে হয়। এখানে-ওখানে, যেখানে-সেখানে পাথরের এই ভাঙা-ভাঙা কবিতা ছড়ানো। কোনোটা হয়-তো কখনো শেষই হয়নি, কোনোটা হয়-তো আরম্ভ হয়েছিলো মাত্র। মনে হয় এ-দেশের লোকের এককালে মন্দির বানানো ছাড়া আর কোনো কাজই ছিলো না। কি মনে হয় এ ছিলো তাদের অবসরের প্রধান খেয়াল ; জীবিকার কাজের ফাঁকে-ফাঁকে পাথরের বোবা সুর নিয়ে এই খেলা। সে কি চমৎকার সমাজ নয়, যার সরিকরা দিনের কাজের শেষে এসে জোটে দেবতার খেলাঘর বানাবার

কাজে, সেই পাথরের ছন্দ তাদেরই হৃদয়ের ছন্দ নয় কি? সকল শিল্পের মধ্যে স্থাপত্য চরম নৈর্ব্যক্তিক; তা একজনের নয়, তা হাজার লোকের; তা সমস্ত জাতির অন্তরের একটি ভঙ্গির প্রকাশ। সে-ভঙ্গি বিশেষ ক'রে ভক্তির। পৃথিবীর ইতিহাসে এইটে দেখা গেছে যে স্থাপত্যের প্রধান প্রেরণা ধর্মই জুগিয়েছে চিরকাল। দেবতার গৃহনির্মাণে শুধু একজন শিল্পীর কলাচাতুর্য্য নয়, আছে সমস্ত জাতির প্রার্থনা ও উদ্দীপনা; উদারতম অর্থে সে-প্রেরণা ধর্মের। মন্দির গড়তে যে-উৎসাহ প্রাণে আসে, তা আসতেই পারে না সিনেমার ঘর কি পোলিটিকাল বক্তৃতার আস্তানা বানাতে, যা-ই বলুক্ না আধুনিক মন। আজকের দিনে এ-কথার প্রমাণের অভাব নেই। বিজ্ঞানের ময়দানব চমক-লাগানো আজব বাড়িই বানাতে পারে, তার বেশি পারে না। লোক-লস্কর হাতিয়ার প্রচুর আছে, অভাব প্রেরণার। বাহবা নেয়াই তার উদ্দেশ্য, যেমন একশ্রেণীর লেখক মনে-মনে পাঠকের হাত-তালি শুনতে-শুনতে লেখে। অবাক ক'রে দেয়াটাই নয়া-দিল্লি আর ভিক্টরিয়া মেমরিয়ল আর আধুনিকতম প্রমোদভবনের লক্ষ্য ও সার্থকতা। অনেক খরচে অনেক চমকে যন্ত্রের অনেক কৌশলে কাণ্ড বটে একখানা। কিন্তু গির্জা বানাবার প্রেরণা আর নেই। মানুষের মনই বদ্‌লে গেছে। পৃথিবীর সব চেয়ে আজব ছবিঘর বানাতেও মজুররা নেহাৎ পয়সার জন্য কাজ করবে, কাজ ক'রে জীবন ধন্য মনে করবে না। যাদের হাতে মন্দির গ'ড়ে উঠতো তারা জানতো সে-কাজ পুণ্যের। সেই পুণ্যেই মন্দির পবিত্র।

ভালোবেসে যা করি, আর যা করি নেহাৎই টাকার জন্য, কাজের এই দুই প্রকৃতি শুধু আলাদা নয়, পরস্পরের বিরোধী।

ভালোবাসার কাজে শরীর আর মনের বিকাশ, নিছক রোজগারের কাজে বিনাশ। তার প্রমাণ আমাদের অনেককেই বোধ হয় প্রতিদিনের জীবনে পেতে হয়। নিজেকে দিয়েই বলি। আমার এই লেখার কাজে আমি তীব্র আনন্দ পাই, যে-আনন্দ পাই, সে-আনন্দ কখনো যন্ত্রণার মত। ঈশ্বর জানেন, যে-কাজে প্রতি মুহূর্তে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে তীক্ষ্ণ-সজাগ রাখতে হয় তার চেয়ে কষ্টের আর-কোনো কাজ নয়। আপিসের আট ঘণ্টার ধরা-বাঁধা কাজে যে-পরিশ্রম, নিজের ঘরে ব'সে তিন-চার ঘণ্টা একটানা কিছু লেখাতে পরিশ্রম তার দ্বিগুণ, এ আমি শপথ ক'রেই বলবো। এবং ঈশ্বর জানেন, এই লেখার কাজের কোনো আর্থিক অনুপ্রেরণা বাঙালি লেখকের অন্তত নেই। তবু কিছুদিন ধ'রে কিছু না-লিখলেই আমার মনে হয় জীবন যেন ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে। লম্বা মাইনেওয়ালা দশটা-পাঁচটার চাকুরে হবার সুযোগ যদি বা পাই, লুব্ধ হবো না এমন কথা বলিনে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়-তো রাজি হ'বো না।

এর মূলে কি আছে আমার গর্বের ভাব? কিন্তু এই গর্বই বা কোত্থেকে আসে? পরিশ্রম অতি কঠিন, উপার্জন অতি ক্ষীণ; তবু এই গর্ব টেঁকে কিসের জোরে? নিশ্চয়ই কিছু আছে, যাতে পুষিয়ে যায়, যাতে ক্ষয়ের চেয়ে লাভ হয় বেশি। সেটা আর-কিছুই নয়, সেটা কাজেরই আনন্দ। ফরমায়েসি কাজের ক্লান্তি মনকে সহজেই আক্রমণ করে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত কাজের ক্লান্তি শুধুই শারীরিক। জীবনে আর খুব কম উপলক্ষ্যই আছে, যাতে আমার মন এমন নিবিড় নিটোল খুসিতে ভ'রে ওঠে, যেমন হয় এক প্রস্থ লেখা শেষ ক'রে উঠলে। ভারি সার্থক মনে হয় নিজেকে। লেখার আসল

পুরস্কারটা তখনই হাতে-হাতে পাওয়া যায়, অন্য সব পরবর্ত্তী ও প্রাসঙ্গিক।

সব কাজই এইরকম হওয়া উচিত। পৃথিবীর যন্ত্র-যুগের আগে সকল পেশাই ছিলো ব্যক্তিগত, লিমিটেড কোম্পানির তাঁবেদার নয়। তখন জীবিকার সঙ্গে জীবনের (লরেন্সের একটি অপরূপ কথা চুরি ক'রে বলছি) এই কঠিন বিরোধ ছিলো না। যে-কাজে উপার্জন সে-কাজেই ছিলো আনন্দ। ধরা যাক্, ঘরে ব'সে নিজের খেয়ালমত নানা রঙে ও ছাঁচে পুতুল বানাতে ফূর্ত্তি কম নয়, এবং সে-পুতুল হাটে বেচে অন্ন-বস্ত্রেরও সংস্থান হ'তে পারে। এদিকে পুতুলের কারখানায় আট ঘণ্টা খেটে অন্নবস্ত্রের সংস্থানটা হয়-তো বেশ ভালোরকমই হয়, কিন্তু তার নীরস ধূসর একঘেয়েমি মৃত্যুর মত। এ-যুগ নিতান্তই বৈশ্য যুগ, নেহাৎ জীবিকার জন্য পরিশ্রম এ-যুগেরই বিশেষত্ব। মানুষের পক্ষে জীবিকার ব্যবস্থা না-করলেই নয়, ইতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের এই একটা মস্ত অসুবিধে। কিন্তু সে-ব্যবস্থা কি হ'তেই হবে নিষ্প্রাণ নিরানন্দ ব্যক্তিত্ব-স্পর্শহীন? কাজকে আমরা আজকাল বন্ধন ব'লে ভাবতে শিখেছি, কিন্তু কাজেই তো মানুষের মুক্তি, যদি কাজের মত কাজ হয়। আদর্শ সমাজ-সংগঠনের প্রধান সর্ত্তই এই যে তাতে মানুষের উপার্জনের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গতি থাকবে। পৃথিবীতে নানারকম মানুষের জন্য নানারকম কাজ থাকতে বাধ্য, তার মধ্যে ছোট-বড় ভেদও অনিবার্য্য, কিন্তু যদি হয় ব্যক্তিগত ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত, কোনো কাজই তাহ'লে হীন হয় না। আর আজকাল বড় কাজও প্রায়ই হীন। কেননা সব কাজই প্রায় অন্যের কাজ। যত ক্ষুদ্রই হোক, এ-কাজ আমার এটা ভাবতে পারলেই মুক্তি। পঁচিশ টাকার

কেরানি আর হাজার টাকার আম্‌লা—হীনতা উভয়েরই সমান। দু'জনেই পরের কাজে নিযুক্ত। কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সত্তা স্বীকার্য্য নয় কারুরই। এর ফলে কাজও নষ্ট হওয়া উচিত; তবে বখশিষের লোভে-লোভে কাজ যদি বা আদায় হয়, মানুষগুলো যে নষ্ট হয় এটা নিশ্চিত।

আমার লেখার কাজের মস্ত সুবিধে এই যে তাতে বেশ একটা খেলার ভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের শিশু ভুল বলেনি; লেখা ব্যাপারটা আসলে লেখা-লেখা খেলা। এখানে অনেকটা যেন আছে শিশুর খেলার স্বাধীনতা। আমি ইচ্ছে-মত বিষয় নির্বাচন করতে পারি, এবং এটা মানতেই হবে যে বিষয়ের ভাণ্ডার অপরিসীম। তারপর এই কথাগুলোকে যদি খেলেনা মনে করা যায়, সেগুলো নিয়ে যেমন খুসি নাড়াচাড়া ভাঙাগড়া করি, ভালো না-লাগলে ফেলে দিই, দরকার হ'লে নতুন তৈরি ক'রে নিই—মোটের উপর সমস্ত জিনিসটাকে নিজের পছন্দমত একটা রূপই দিই।

সমস্ত কাজেই এই খেলার ভাব খানিকটা থাকা দরকার। আর এই খেলার ভাব আসলে সকল কাজেই কিছু-না-কিছু আছে; কিন্তু সেটা আধুনিক সভ্যতা খুব নিপুণ হাতেই ছেঁটে ফেলে, তার বদলে চালায় কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের স্থূল নিশ্চল ভার। মনে করুন, মস্ত একটা জাহাজ বানাবার চাইতে অদ্ভুত উত্তেজক খেলা আর কী হ'তে পারে? অনায়াসে সমস্ত লোককে ডাক দিয়ে বলা যায়: এসো ভারি একটা মজার খেলা খেলবে। কিন্তু এই সভ্যতা ডাক দেয় এই ব'লে: এসো তোমাদের বেকার জঠরে কিছু রুটি-মাংস চালান করি। দলে-দলে লোক ছুটে আসে পেট ভরাবার টানে; তারা দেখে জাহাজকে তাদের খাদ্যদানের যন্ত্র,

দেখে না জাহাজ অপরূপ কোনো বিশাল পাখির মত জল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দিগন্তের সমুদ্রের দিকে চলেছে। যে-জাহাজ তাদের নিয়ে যেতে পারতো মুক্তির মোহানায় তা হ'য়ে রইলো নিতান্তই রুটি-মাংসবাহী মালজাহাজ।

ভুবনেশ্বরে চারদিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিলো, মন্দির বানানো ছিলো এ-দেশের লোকের উদ্দাম আনন্দের খেলা। তাতে কোনো দায় ছিলো না, ছিলো না কোনো ভাবনা ; যেমন আমরা গুন্‌গুন্‌ ক'রে গান করি অবসরের সোনালি সময়ে, তারপর তা-ই থেকে ফুটে ওঠে নতুন বিচিত্র সুর, তেমনি এদের রঙিন আলস্যের লীলা পাথরের অপরূপ ছন্দে। বিশেষ ও নির্দিষ্ট কোনো সঙ্কল্পের ফলে একটি তাজমহল হয়, কিন্তু তার পিছনে যদি থাকতো এই চিন্তাহীন খেলার হাওয়া তাহ'লে তার আশে-পাশে হাজার ছোট-ছোট ভাঙাচোরা তাজমহল গ'ড়ে উঠতো। তাজমহল একজনের, এই মন্দিরগুলো সকলের। শিল্পসৃষ্টি অত্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার ; কিন্তু সে-আনন্দের ভাগ সমস্ত জাতিকে এক স্থাপত্যই বুঝি দিতে পারে। যারা হাত দিয়ে কাজ করে না, তারাও মন দিয়ে যোগ দেয়। একদা ভারতবর্ষের দক্ষিণাপথে নিশ্চয়ই কোনো বিশাল সর্বব্যাপী অনুপ্রেরণা এসেছিলো, তারই হাওয়ায় ফুটেছে পথের ধারে-ধারে বসন্তের ফুলের মত এত অজস্র মন্দির। এই অজস্রতা দেখেই অবাক লাগে ভুবনেশ্বরে। এখানে আকাশে-বাতাসে পুঞ্জ-পুঞ্জ পাষাণের নীরব বন্দনা। কোনো রাজার দেবশক্তির সাড়ম্বর বিজ্ঞাপন নয় এখানকার মন্দির। সরল নির্মল নির্মম এই ভুবনেশ্বরের মন্দির, তাতে কোনো অলঙ্কারের উপসর্গ নেই, সোনামণিমুক্তার প্রগল্‌ভতা থেকে এ আশ্চর্যরকম মুক্ত। দেবতার মহিমা মহামূল্য

বিশাল সামগ্রীতে প্রকাশ পাবে, এ নিতান্তই গ্রাম্য মনের কথা। এই গ্রাম্যতায় হিন্দুর অনেক মন্দিরই পীড়িত। ভুবনেশ্বরে তার চিহ্নমাত্র দেখলুম না। ঠাণ্ডা কালো কষ্টিপাথরের নগ্ন মূর্তি-গুলো কারুরচনায় আর মুখশ্রীর অপূর্ব ব্যঞ্জনায় এতই সুন্দর যে দেখেই মনে হয় তারা ঐশ্বর্যের ঘোষণা নয়, ভালোবাসার প্রকাশ। যে-নির্জনে দেবতার ঘুম ভাঙে সেই নির্জনতা এখানকার সুর। তা ছাড়া, তীর্থ যত বড়, পাপের আস্তানাও তত বড় এইটেই সাধারণত দেখা যায়। দেবতা যেখানে জাগ্রত, সেখানে বেশ্যা, গুণ্ডা, জোচ্চোর, ভিক্ষুক, ব্যাধিগ্রস্ত—এরাও ঘুমিয়ে নেই। পুরীর মন্দিরের আশে-পাশে হাটবাজার, ধুলো, নোঙরামি, চ্যাঁচামেচি ভিড়ের ঠেলাঠেলি—সবই হয়তো সহ্য করা যেতো, যদি এতৎসত্ত্বেও তার শিল্পরূপ হ'তো সার্থক। জগন্নাথ-দেবের গৃহ বিশাল বটে, কিন্তু বিশালতাই বোধ হয় তার একমাত্র অভিজ্ঞান; তা ছাড়া কোনোরকম আকর্ষণই নেই। আমাদের অভিরুচি সরল নির্মল ভুবনেশ্বরেই। ভুবনেশ্বরে ভিড় নেই। চারদিক পরিষ্কার, চারদিক চুপচাপ। এই ছোট্ট গ্রামে মানুষই বা কত, আর স্থায়ী বাসিন্দারা প্রায় সকলেই কোনো-না-কোনোভাবে মন্দিরের সঙ্গেই যুক্ত। জিনিসের বেচাকেনায় প্রাচীন পৃথিবীর মন্থরতা; যদিও দু'মাইল দূর দিয়ে রেল-লাইন গেছে, আধুনিক ব্যবসার তাড়াহুড়োর ধাক্কা এখনো এসে যেন পোঁছয়নি। চারদিকের প্রশান্তির মধ্যে মন্দিরের গম্ভীর অভীপ্সা আকাশে উদ্যত; আর সেদিন সকালে পরিচ্ছন্ন মন্দির-প্রাঙ্গণের এককোণে ব'সে চারদিকে তাকিয়ে যেন মনে হ'লো কোনো চিরন্তন সকালবলার একটি সুর এখানে ধরা পড়েছে; এখানে আটকে রয়েছে যে-সুর, এ-যুগের

পৃথিবীতে তা আর নেই, নেই আমাদের জীবনে, আমাদের আলস্যে কি স্বপ্নেও নেই। প্রগতির চাকায়-চাকায় পৃথিবী এগিয়ে চ'লে গেলো, তার টান এখানে যেন লাগলো না, এখানে রইলো কোনো সুগন্ধি অতীত চিরকাল হ'য়ে।

বৃষ্টি কেটে গেছে,
আকাশে ছেড়াখোঁড়া সাদা মেঘ,
রোদের ঝিলিমিলি তার ফাঁকে।

বাতাসে প্রথম শীত,
বাতাসে ধার ;
দিঘির নীল জল উঠছে শিরশিরিয়ে
যেন কোনো হৃদয় ভালোবাসার ভার আর সইতে পারছে না।

বৃষ্টি কেটে গেছে।

আমরা স্নান ক'রে এসেছি
আঁকাবাঁকা গ্রামের পথ দিয়ে,
দু'দিকে মাঠ দিগন্ত ছোঁয়-ছোঁয়,
মাঝখানে ঠাণ্ডা জলের ঝরনা,
আর পায়ের নিচে কাঁকর।

বৃষ্টি কেটে গেছে।
আমরা ডুব দিয়েছি ঝরনার জলে
ঝরনার উৎস-মুখে ;
ফুলের মত মেলে' দিয়েছি আমাদের শরীর
এই নতুন শীতের নতুন সূর্য্যের দিকে।

এই নতুন-নীল আকাশের দিকে
চারদিক থেকে উঠেছে হাজার মন্দিরের চূড়া,
মাঝখানে নির্ম্ম ভুবনেশ্বর।

বৃষ্টি কেটে গেছে,
আমরা স্নান ক'রে এসেছি।

সমুদ্র আর দূরে নয়,
আজ বিকেলে আমরা সমুদ্রের কাছে গিয়ে দাঁড়াবো।
আর আজ এই নতুন সূর্য্যের আলোয়
হাজার মন্দিরের পাথরের ছন্দে
একটি প্রার্থনা আমরা এঁকে গেলাম
একটি প্রার্থনা আমরা রেখে গেলাম

—তারপর সমুদ্র।

৫

ময়ূরকণ্ঠি সমুদ্র আকাশে গিয়ে মিশেছে। আকাশে আলো। ঢেউগুলো গড়িয়ে চলেছে আলোর ঝলকে-ঝলকে লুটোপুটি ক'রে। সবুজ সমুদ্র। হলদে সমুদ্র। বেগনি সমুদ্র। নতুন রঙ লাগছে প্রতি মুহূর্তে। ব'সে-ব'সে দেখা। শুয়ে-শুয়ে জানলা দিয়ে দেখা। চিরকাল এমনি চেয়ে থাকা যায়— বাদামি আর বেগনি আর সবুজ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। কানে লাগছে শোঁ-শোঁ শব্দ, আর ঢেউয়ের ধাক্কার গুমগুমানি আর হাজার তোলপাড়ের চীৎকার। ঘুম আসছে। ঘুমোবো না। আর-একটা সিগারেট ধরাবো, জোর ক'রে চেয়ে থাকবো। দেখবো আকাশ, দেখবো সমুদ্র ; সমুদ্রের রাশি-রাশি শব্দের মধ্যে কখন্ যেন আসে হঠাৎ এক পলকের বিরতি, রইবো কান পেতে তারই জন্য। আর একটু পরেই তো ওরা এসে ডাকবে।

তবু তন্দ্রা আসে। হোটেলের তেতলার একটি মাত্র ঘর আমরা দখল করেছি। মস্ত ছাদটা আমাদেরই কপিরাইট্, কিন্তু ঘরটি বড় ছোট। তায় টেবিলে আলনায় তক্তপোষে এমন ঠাসা যে পা ফেলবার জায়গা নেই। সুতরাং ঘরে থাকলে শুতে হয়, এবং এই দুপুরবেলায় শুলেই তন্দ্রা আসে। মধ্যাহ্ন-ভোজনটা প্রতিদিনই প্রায় ভোজ হ'য়ে ওঠে, সেটাও তন্দ্রার সহায়ক। সমুদ্রে স্নানের পর দুর্দান্ত ক্ষুধিত হ'য়ে ফিরে আসি।

আমরা লোনা জলটা গায়েই শুকোতে দিই; 'ভালো' জলে আবার বাথরুম-মাফিক মাজা-ঘষা নিতান্তই অকারণ। শরীরটা খানিকক্ষণ বেশ কড়কড় করে। খাওয়াটা হয় প্রচণ্ড উৎসাহে, ঠাকুরের সব রান্নাই চমৎকার। তারপর ভরা দুপুর, আর সমুদ্র, আর আমরা। বিকেলে আর-একবার স্নান করবো। যে-ক'দিন পুরীতে আছি, স্বাস্থ্য ভালো করতে হবে।

আমাদের সমস্ত শরীরে একটা অস্ফুট মধুর ব্যথা। সমুদ্র আমাদের মেরেছে। সমুদ্র আমাদের নিয়ে খেলা করে। বালুর উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে হঠাৎ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বড় ভালো। কিন্তু একবারেই ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করো, ঐ ঢেউ আসছে। পাশে আছে জং বাহাদুর আর গোবিন্দ, ভয় নেই। ঐ এলো ঢেউ। ডুব দাও। মাথার উপর দিয়ে সাতশো ঘোড়া লাফিয়ে চ'লে গেলো। শোনো গর্জন, ঢেউ লাগলো তীরে। শোঁ ক'রে ফিরে যাচ্ছে, দ্রুত ঘূর্নির টানে আমরাও বুঝি ভেসে গেলাম। পাক খেয়ে পড়ি বালু-মেশানো, বালু-বাদামি জলে, হাত দুটো নরম বালুতে ডুবিয়ে দিয়ে শক্ত হ'য়ে প'ড়ে থাকি। ঢেউ স'রে যায়, আমরা প'ড়ে থাকি বালুর বিছানায়, যেন প্রত্যাখ্যাত। আমরা উঠে ছুটে যাই এগিয়ে; ঐ ঢেউ এলো।

এলো। লাফ দাও। ঠিক হ'লো না; মুখে প্রচণ্ড বাড়ি মেরে চ'লে গেলো ঢেউ। সর্বনাশ, ঐ আর-একটা, আমরা তো হাঁপিয়ে গেছি। ভয় নেই, জং বাহাদুর আর গোবিন্দ আমাদের তুলে ধরেছে। আমরা ঢেউয়ের উপরে। পাহাড়ের মত উঁচু হ'য়ে ঢেউ এলো। গোবিন্দ আর জংবাহাদুরকে দেখা যাচ্ছে না, ওরা ডুবে গেছে, আমাদের এক হাতে ধরেছে উপরে,

আমরা ঢেউয়ের ঘোড়সওয়ার। হঠাৎ চকিতে নেমে গেলুম, এ কী অপূর্ব দোলা লাগলো শরীরে। আমরা ভাসছি, নাচছি। ক্লান্ত হয়েছি আমরা ; গোবিন্দ আর জং বাহাদুর সাঁতরাচ্ছে, আমরা ওদের পিঠে চড়েছি গলা আঁকড়ে ধ'রে। ওরা আমাদের ফেলে দেবে না। ওরা আরো দূরে যেতে চায়, আমরা বারণ করি। ওদের ভয় নেই, সমুদ্র ওদেরই। সমুদ্রের জলে মাছের মত ওরা। সমুদ্রের জল লেগে-লেগে চিক্কণ মসৃণ কালো এদের চামড়া। এরা মান্দ্রাজ উপকূলের মানুষ, পাঁচটা-ছ'টা ভাষা মোটামুটি বলতে পারে। গোবিন্দ বড় বেশি কথা বলে, ওর মুখে রাজা-উজির ছাড়া কথা নেই। গোবিন্দ চ'টে গেলে ওর বৌকে মারে। জং বাহাদুর প্রকাণ্ড লম্বা, সমুদ্রের ধার দিয়ে হাফ্ প্যাণ্ট্ আর নীল জর্সি পরা জং বাহাদুর যখন লম্বা ঠ্যাঙ ফেলে হেঁটে যায়, দেখায় ভারি জমকালো। ও গম্ভীর মানুষ, বেশি কথা কয় না। গোবিন্দ ওর তুলনায় একটা ফাজিল চালিয়াৎ। আর ওদের দু'জনের তুলনাতেই আমরা নিতান্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। ঢেউয়ের এত দাপাদাপিতেও ওদের মাথার খড়ের টুপি কখনো খুলে যায় না। আর যদি বা হঠাৎ খুলে যায়, সেই উন্মত্ত তোলপাড়ের মধ্যেও চট্ ক'রে সেটা ধ'রে ফেলে, তক্ষুনি মাথায় প'রে নিয়ে আবার ডুব দেয়। দু'জনেই ওরা আশ্চর্য্য।

কার্ত্তিক মাস, জলে একসঙ্গে বেশিক্ষণ থাকা যায় না, শীত করে। ভিজে শরীর নিয়ে উঠে আসি, ধুপ ক'রে ব'সে পড়ি উষ্ণ-নরম বালুর উপর, ঘন-ঘন লম্বা নিশ্বাস পেট থেকে উঠে আসে বুকের ভিতর দিয়ে। আমরা হাঁপাচ্ছি, আমরা কাঁপছি, দূরের সমুদ্র কাঁপছে। মুঠো-মুঠো গরম বালু নিয়ে মাখি শরীরে,

শ্যামায়মান আমাদের শরীর, আমাদের রক্তে সূর্য্যের ঘ্রাণ, সূর্য্যের গান আকাশে-আকাশে। আমরা সূর্য্য-গুঞ্জিত, আমরা সমুদ্র-উত্থিত। এই তো আমরা শুয়ে পড়েছি বালুর উপর, টান হ'য়ে, এক হাত মাথার নিচে, আর এক হাত চোখ আড়াল করেছে। আমরা ঋজু, আমরা ক্ষীণ, আমাদের শরীর এই উষ্ণ-মধুর দিনের মধ্যে গ'লে গেলো। দূরের সমুদ্র ইস্পাতের মত ঝল্‌সাচ্ছে। গোল হ'য়ে ঘুরছে সমুদ্রের সাদা পাখিরা, হঠাৎ ছোঁ মেরে মাছ তুলে নিচ্ছে জল থেকে। আমরা মুক্ত, আমরা ঐ পাখিদের মত দায়িত্বহীন। আমরা বালুর উপর দিয়ে গড়াবো। বালুর মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়ে হাত ঢুকিয়ে দেবো, সেখানে ভিজে ঠাণ্ডা। মুখ ডুবিয়ে দেবো শিরশিরে ভিজে বালিতে। যেখানে এসে ঢেউ শেষ হয় সেখানকার নরম, নরম বালুতে উপুড় হ'য়ে শুয়ে থাকবো। আমাদের উপর দিয়ে চ'লে যাবে নিঃশেষিত ঢেউ। হঠাৎ জোরে এসে ছিটকে ফেলে দেবে দূরে। আমরা ভয় করিনে, আমাদের ভালো লাগে এই খেলা। ভিজে বালিতে আঙুল দিয়ে আঁকিবুঁকি কত কী লিখি, ঢেউ এসে মুছে দিয়ে যায়। চিরকাল নিটোল মসৃণ এই বালুতট, কেউ এতে কোনোদিন একটি আঁচড় রাখতে পারবে না।

আমাদের বিশ্রাম হয়েছে, এবার স্নানের দ্বিতীয় কিস্তি। গোবিন্দ এসে দু'বার তাড়া দিলো, ও কথা বলে বেশি। গোবিন্দ আর জং বাহাদুরের সময়ের মূল্য আছে, আমাদের নেই। জং বাহাদুর গম্ভীর মানুষ ; একটু দূরে গিয়ে বালুর উপর লম্বা কালো শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে ছিলো, এইবার উঠে এলো। ওদের হাত ধ'রে আমরা আবার নামলুম। ওরা ধীর। ওদের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত আমরা। নেহাৎ আনাড়ি, নেহাৎ দুর্বল, ওদের

হাতে আমাদের প্রাণ। মস্ত ঢেউ যখন উঁচিয়ে আসে, গোবিন্দ আমার দু'কাঁধ ধ'রে বলে, 'হামাকে একখানা কাপড় দেবেন।' গোবিন্দ নির্বোধ নয়, পুরস্কার চাইবার ঠিক সময় ও জানে।

বেলা বেড়েছে। আকাশ ঝকঝক করছে। জেলেদের যে-সব নৌকো সকালবেলায় রওনা হয়েছিলো, এতক্ষণে তারা ঐ দূরে কালো একটা ফুটকি। বিকেলে ওরা ফিরে আসবে মাছ নিয়ে। কাঠের ভেলার মত নৌকো ক'রে কোথায় চ'লে যায় ওরা। ওদের ভয় করে না, আমাদের যেমন বাস্-এ চড়তে ভয় করে না। বড় নৌকোও আছে, পারে প'ড়ে থাকে সেগুলো। ওরা সেগুলো চড়ে না, ভাড়া খাটায়। তারই একটায় আমরা আজ বেড়াবো।

রোদ চড়ছে, খিদে পেয়েছে, আর থাকা যায় না। সমুদ্রের জল কখন্ নেমে গেলো। যথেষ্ট ক্লান্ত হয়েছি। এই কাপড়, এই চটি, এই ছাতা। হোটেল মনে হয় কতখানি রাস্তা। সমস্ত দুপুরবেলাটা অলস ভ্রমর। সমুদ্রে আমরা আচ্ছন্ন। সমুদ্রে আমরা ভ'রে আছি। সমুদ্র নীল নয়। রূপোর মত সাদা, কি মেঘের মত ধূসর, কি বাদামি কি বেগনি কি সবুজ। নীল নয় কখনোই। একবার, শুধু একবার আমরা দেখেছিলাম নীল সমুদ্র। সে আশ্চর্য্য। হঠাৎ যদি আকাশ ফাঁক হ'য়ে স্বর্গ ঝলসে ওঠে চোখের সামনে, এ তেমনি। সিঁড়ির মত ধাপ বেয়ে ঘুরে-ঘুরে উঠছি কোনারকের মন্দিরে। একটু ভয়ে-ভয়েই উঠছি; মন্দিরের সৌন্দর্য্যের চেয়ে নিজেদের পায়ের দিকেই বেশি নজর। মাঝামাঝি এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালুম। হঠাৎ খুলে গেলো চোখের সামনে দিগন্তরেখার মত বাঁকা

সমুদ্র। নীল, নীল। 'স্বপ্নের ঢেউ-তোলা নীল সমুদ্র' এরই নাম। এ আমরা আশা করিনি, সমুদ্র এত কাছে আমরা জানতুম না। তবু এত কাছে নয় যে শব্দ শোনা যায়। চার-দিকের গভীর স্তব্ধতায় শুধু বিশাল ঝাউবনের হাওয়ার ঢেউ। অপরূপ, অবিশ্বাস্য কোনো স্বপ্নের মত নীল, নীল সমুদ্র প্রসারিত। মুহূর্ত্তে যেন মিটলো চোখের চিরকালের তৃষ্ণা। এমনি কোনো দেখা জীবনে ঘটলে এই ভেবে আক্ষেপ হয় যে চোখের দেখাকে আমরা কোনোরকমেই স্থায়ী করতে পারিনে। সমস্ত প্রাণ দিয়ে দেখেও কতটুকুই বা দেখতে পারি! চ'লে আসতে হয়; শরীরের স্থানান্তরে দেখার অবসান। তা ছাড়া, এক মুহূর্ত্তের দেখার চাইতে এক ঘণ্টার দেখা যে অবশ্যতই বেশি, তাও নয়। বরং প্রথম অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তেই যা দেখবার সমস্তটাই একসঙ্গে দেখে নিই। তারপর শুধু মনের উপর দাগ বুলোনো। কিন্তু সে-দাগ পাকা হয় না। বছর কাটে, রঙ ফিকে হ'য়ে আসে। যে-কবিতা ভালো লাগে, তা মনের মধ্যেই রাখতে পারি; মনের মত বইটিকে কাছাকাছি রাখতে পারি সব সময়। চোখের দেখা হারিয়ে যায়। ক্যামেরা দিয়ে এই দেখাগুলোকে যারা আটকে রাখতে চায়, নিতান্তই তারা সেন্টিমেন্টাল মানুষ। হায়রে নিখুঁত ফোটোগ্রাফ! মৃত প্রিয়জনের ছবি জমকালো ক'রে ঘরে বাঁধিয়ে রাখা—নিজের শোকের বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কী? যে মরতেই পারলো তার আবার ছবি! জ্ঞানীর কি কলাবিদের আগ্রহ যদি না থাকে, তাহ'লে নানা জায়গার ছবি তোলা ও রাখার মুখ্য উদ্দেশ্যই নিজের পর্য্যটনের দলিলরচনা। প্রতি ভ্রমণকারীর অ্যালবামের উপর অদৃশ্য কিন্তু অতি স্পষ্ট অক্ষরে এই কথাটাই লেখা থাকে: দ্যাখো আমরা কত বেড়িয়েছি!

ক্যামেরার ছবি তো মরা ; আসল ছবি থাকে মনে, হঠাৎ একদিন চমকে দেয় মুহূর্ত্তের তীক্ষ্ণতায়, হঠাৎ জ্ব'লে ওঠে রঙিন মেঘে-মেঘে কল্পনার আকাশে। কিন্তু স্বচ্ছ, নিটোল সেই মুহূর্ত্তটি বুদ্বুদের মত ফেটে যায়, মুছে যায় মেঘ—তারপর হয়-তো আমরা ভুলে' যাই, হয়তো আবার মনে পড়ে অনেক, অনেক দিন পরে। তবু মৃতের স্মৃতিসঞ্চয়ের মত ফোটোগ্রাফ নাড়াচাড়া ক'রে কৃত্রিম মনে-পড়ার চাইতে স্বাভাবিকভাবে ভুলে যাওয়া অনেক ভালো। আর যাই হোক্, মনটাকে জাদুঘর ক'রে তুলতে আমি নিতান্ত নারাজ।

সেদিন বিকেলে সমুদ্র ছিলো বার্নিশ-করা কাঁসার মত ঝকঝকে। ঢেউগুলো জলন্ত রোদ দিয়ে মাজা। সূর্য্য হেলেছে পশ্চিমে, নেমেছে সোনার বন্যা তির্য্যক স্রোতে, চোখ ঝলসে যায়। আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, দরজার বাইরে গোবিন্দ ডাক দিলে। নৌকো প্রস্তুত। মস্ত বড় নৌকো, আট-দশ-জন মাঝি, কোনো ভয় নেই। গোবিন্দ আর জংবাহাদুর থাকবে তীরে দাঁড়িয়ে, দুর্ঘটনার কোনো লক্ষণ দেখলেই তীরের মত ছুটে যাবে সাঁৎরে। ফুরফুরে হাওয়া বইছে, বিকেলি ঢেউগুলো ছোট-ছোট। সমুদ্রের বুকের উপর সাদা পাখির ফুটকি। আমরা পার হ'য়ে যাবো ঢেউ, যাবো সেখানে যেখানে পাখিরা পাখা মুড়ে জলে বুক চেপে ব'সে। আতঙ্কসঙ্কুল জল-রাশি চাষ করবে এই নৌকোর হাল। নিচে অক্টোপাস, নিচে হাঙর, কত দাঁত-দেখানো দুঃস্বপ্ন। আমাদের ভয় নেই। আমরা বেরোলাম নতুন দ্বীপের সন্ধানে, আমাদের কল্পনার উপনিবেশ। নতুন দেশ জয় করবো আমরা। ঐ তো সমুদ্র ধূ-ধূ করছে ; সোজা রওনা হ'লে দিনের পর দিন ভাসতে-

ভাসতে কোথায় গিয়ে ঠেকবো? হয়তো বর্মার কোনো ঘোর জঙ্গলে, যেখানে মানুষ এখনো যায়নি।

আমরা রওনা হয়েছি, গোবিন্দ আমাদের নৌকোয় তুলে দিয়েছে কোলে ক'রে। পায়ে আমাদের জুতো, গায়ে সভ্যতার বস্ত্র। নতুন দেশ আবিষ্কার করার মত চেহারা নয় আমাদের। শরীর সঙ্কীর্ণ, স্থানকালে আবদ্ধ; মন মুক্ত, মনের সীমা নেই। আমাদের মনকে আমরা উড়িয়ে দিয়েছি এই সমুদ্রের লোনা হাওয়ায়। সমুদ্র ঝলমল করছে, সমুদ্র ঝকঝক করছে। চলো, চলো। আমাদের কাপ্তান মনে-মনে মন্ত্র পড়লো, তারপর আটজন খালাসি চীৎকার ক'রে উঠলো একসঙ্গে। দুলে উঠলো নৌকো। ঢেউ পার হচ্ছি আমরা। কাপ্তান খালাসিদের হুকুম দিচ্ছে থেকে-থেকে, অদ্ভুত ওদের ভাষা, অদ্ভুত ওদের কালো-কালো দস্যুর মত চেহারা। ঘোড়ার মত চলেছে নৌকো, ঢেউয়ের তালে-তালে লাফিয়ে উঠছে, ধুপ ক'রে তলিয়ে যাচ্ছে। নৌকোয় জল উঠছে, একজন লোক ব'সে-ব'সে কেবল ঐ জল সেঁচে ফেলছে। মস্ত দোলনায় আমরা দুলছি: এই আকাশে উঠে গেলুম, এই নেমে গেলুম পাতালে। কত-দূর যাবো আমরা এই ঢেউ পার হ'য়ে। মুখে লাগছে জলের ছিটে: মুখে লাগছে হাজার-হাজার মাইল সমুদ্র পার-হ'য়ে-আসা হাওয়া। ঢেউয়ের একটা সারি আমরা পার হয়েছি, সামনে রয়েছে আর-একটা। পুরীর কূল এরই মধ্যে কত দূরে স'রে গেছে; সারি-সারি বাড়িগুলো নিয়ে লম্বা তটরেখা কল্পনার মত অপরূপ, সোনালি আভায় মোড়া। পূব দিকের শেষ মস্ত লাল বাড়িটা কোন রাজার, তারপর জঙ্গল, ঐ কোনারকের পথ। দূরে তাকালে মনে হয় সমুদ্র ঢালু হ'য়ে উঠে গেছে, নাবিকের

চোখের সমুদ্র বুঝি এই : ইংরেজের ভাষায় সমুদ্র উঁচু কি এরই জন্যে ? আর-একটা ঢেউয়ের সারি পার হ'য়ে এলাম। তীরে যে-গর্জন এত প্রচণ্ড, এখন তা শোনা যাচ্ছে স্বপ্নের মর্মরের মত, অস্পষ্ট শোঁ-শোঁ। ভাসছে হাওয়ায়। ঢেউগুলোকে পিছন থেকে দেখছি : ঘাড় উঁচু ক'রে দৌড়ে চলেছে, আছড়ে পড়ছে মুখে ফেনা তুলে। এখন আর অত ভয়ঙ্কর লাগছে না ওদের। এই ঢেউগুলো নিতান্তই স্থানীয় ঘটনা, এখন বুঝতে পারছি। এখানে ঢেউ নেই ; এখানে গম্ভীর বিশাল জল মৃত্যুর মত স্তব্ধ। কোনো শব্দ নেই, কোনো আলোড়ন নেই ; শুধু থেকে-থেকে সমুদ্রের বুক অস্ফুট দুলে ওঠে যেন কোনো চিরন্তন অবিশ্রান্ত দীর্ঘশ্বাসে। কেঁপে ওঠে বুক। কেঁপে ওঠে বুক আমাদেরও, ভয় করে। ঢেউয়ের উতরোল উন্মত্ততা, ও তো সমুদ্রের শিশু-খেলা : ভয় এখানে, এই ভীষণ, স্পন্দিত স্তব্ধতায়। চলো। ঢেউয়ের শব্দ কানে প্রায় মিলিয়ে আসছে। সূর্য্য আরো নেমেছে। হঠাৎ হালের তক্তা খুলে গেলো, জলে ভেসে চললো। ছোট্ট একটা কালো কুচকুচে ছেলে, মুখ ভরা বসন্তের দাগ, তাকে ওরা জলে নামিয়ে দিলে। অনায়াসে ঝাঁপ দিলে সে, ছোট-ছোট হাতের জোর বাড়ি লাগলো জলে ; মাছের মত সাঁতরে গিয়ে ধরলো তক্তা, নিয়ে এলো কুকুরের মত কামড়ে। আশ্চর্য্য ! এই জলেই তো হাঙর আর অক্টোপস, আর কিলবিলে লিকলিকে দাঁতওয়ালা কত জানোয়ার। স্বচ্ছ ধূসর জলে অনেকদূর চোখ যায়, মাঝে-মাঝে জেলিমাছ ফুটে রয়েছে দীর্ঘ-বৃন্ত ফুলের মত। ছেলেটা দাঁত বা'র ক'রে হেসে বললে : আনবো একটা তুলে ? একটাকা দিলেই পারি। আমরা বললাম, দু' আনা দিতে পারি। দ্বিতীয় কথা না-ব'লে ঝুপ

ক'রে নেমে গেলো ছেলেটা। ওর কালো শরীর গোল হ'য়ে জলের নিচে ঝুলছে, গাছের ডাল-ধরা বানর যেন। সগৌরবে নিয়ে এলো জেলি-মাছ—হায়রে, এই নাকি? স্যাঁৎসেঁতে প্যাচপেঁচে একটা ছোট্ট পিণ্ড, একটু পরে রঙটাও ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। শিক্ষা হ'লো : বৃন্ত থেকে ফুল ছিঁড়তে নেই।

এবার আমরা ফিরবো। বিকেল ঢ'লে পড়ছে। হাজার মাইল ভ'রে সমুদ্র প'ড়ে রয়েছে চারদিকে। ছোট-ছোট সাদা পাখিরা এই বসে, এই ওড়ে। পশ্চিমে যেন আগুনের সমুদ্র। পূব দিকে একটি মেঘ গোলাপি হ'য়ে উঠলো। আমরা ফিরছি। দীর্ঘনিঃশ্বসিত বুকের মত সমুদ্রের নিঃশব্দ অলক্ষিত ওঠা পড়া। ঢেউয়ের বেড়া এসে পড়লো, এবার অতি সহজেই লাফিয়ে গেলাম। তীরে দাঁড়ানো গোবিন্দ আর জং বাহাদূরের মূর্ত্তি বড় হ'য়ে উঠছে। আবার ঢেউ। কত অল্প সময়ে এলাম। ঐ আমাদের হোটেল। ফিরে গিয়ে ছাদে ব'সে চা খাবো। ঢেউগুলো এবার বাধা দিচ্ছে না, ঢেউয়ের ধাক্কাই নৌকোকে নিয়ে যাচ্ছে ঠেলে। কানে ভিড় ক'রে এলো ঢেউয়ের দাপাদাপি চীৎকার। কাপ্তান চেঁচিয়ে কী ব'লে উঠলো ওদের অদ্ভুত ভাষায়। নৌকোর নিচে বালি ঠেকলো। গোবিন্দ আর জং বাহাদুর এগিয়ে এসেছে। ওরা হাসছে। আমরাও হাসছি। আমরা জয় করেছি নতুন দেশ, আমরা ফিরে এসেছি।

দ্যাখো না সমুদ্র তোমার কী করে,
এই লোনা নীল জল আর চাবুকের মত হাওয়া।

যেমন শঙ্খ আর ঝকঝকে ঝিনুক
এই ঢেউয়েরা হাজার বছর ধ'রে আঁকে
কত অফুরন্ত রঙে, কত বিচিত্র নক্সায়
বাদামি আর বেগনি আর অপরূপ মসৃণ
আর আঁকাবাঁকা ঢেউ-খেলানো রেখায়—
তেমনি তারা তৈরি করুক তোমার শরীরকে
শঙ্খের মত মসৃণ তোমার শরীর।

একবার নিজেকে দাও না সমুদ্রের কাছে
তারপর ছাখো সে তোমাকে নিয়ে কী করে।

ঢেউ তোমাকে মেজে দিয়ে যাক
সাদা ফেনার তোলপাড়ে ;
সমুদ্র তোমাকে নিয়ে খেলা করুক
তোমার মসৃণ পরিষ্কার শরীর নিয়ে,
তোমাকে জড়িয়ে ধরুক চারদিক থেকে তার বালু-বাদামি জল।
যেমন সে তৈরি করেছে হাজার বছর ধ'রে ধবধবে সাদা শঙ্খ,
তেমনি সে তৈরি করুক তোমাকে, তোমার ব্রাউন মসৃণ শরীর

ভয় কোরো না, সমুদ্রকে ভয় কোরো না,
ওর মধ্যে অফুরন্ত স্নেহ।

ঝাঁপিয়ে পড়ো
এই ফেনিল তোলপাড়ের বুকের মাঝখানে,
ঢেউয়ের সঙ্গে নেচে-নেচে যাও
লাফিয়ে ওঠো ঢেউয়ের চূড়ায়
জলকন্যার মত।

সমুদ্র অপরিসীম, সমুদ্র ভীষণ,
কিন্তু সে ভালোবাসে তোমার সঙ্গে খেলা করতে,
ওর মধ্যে অন্তহীন স্নেহ।

৬

সন্ধের পর সমুদ্রের ধারে বড় মন-খারাপ লাগে। নিঃস্পন্দ নীরন্ধ্র অন্ধকার, আর হু-হু হাওয়া, আর একটা নামহীন দুর্দান্ত আতঙ্কের মত সমুদ্র। তখন ঘোর কৃষ্ণপক্ষ। গভীর, গভীর রাত্রে অসুস্থ পীত চাঁদ ছায়ার মত ফ্যাকাশে আলো মেলে দিতো আকাশে। সন্ধেবেলাটা অন্ধকারে থমথমে। হয়তো সহরের দিকে গিয়েছিলুম, সরু রাস্তা দিয়ে আসতে-আসতে হঠাৎ এক সময়ে সমুদ্রের শব্দে বুক কেঁপে উঠলো। রাস্তা ছেড়ে বীচে এসে পড়লুম ; অন্ধকার সমুদ্র প্রলয়ের জলরাশির মত ভয়ঙ্কর। ভালো ক'রে কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় ভীষণ গর্জন ; বুঝি কোনো অনুচ্চারণীয় সর্বনাশ দাঁত বার ক'রে ছুটে আসছে। মন চায় তখন ঘর, চায় অভ্যাসের আরাম, চায় চারদিকে শক্ত দেয়ালের নিশ্চিন্ততা। টর্চ জ্বেলে-জ্বেলে এগিয়ে চলি, দূরে হোটেলের পেট্রোম্যাক্সে সাধারণ অভ্যস্ত জীবনের আশ্বাস। হারিকেন লণ্ঠনের আলোয় ঘরে ব'সে আছি : সবে সন্ধে হ'লো, এখনই যেন মধ্যরাত্রি। এসো কিছু পড়ি। এসো চিঠি লিখি। কিছু কাজ নেই। ভয়াল একটা দুরন্ত উপস্থিতির মত সমুদ্র, হাওয়াটা কান্নার মত, অন্ধকার যেন মৃত্যুর হাঁ-করা দরজা। হাওয়ায় উড়ে চলছে জোনাকির পাল। সমুদ্রে স্ফুরজ্যোতি পতঙ্গদল থেকে-থেকে ঝিলকিয়ে উঠছে। আমরা ব'সে আছি চুপ ক'রে।

এই সময়টাতেই কলকাতার কথা মনে পড়ে। প্রকৃতির কোনো মহান প্রকাশের খুব কাছাকাছি থাকা উচিত নয় বোধ হয়। অতি প্রবল তার প্রভাব, তার চাপে আমাদের মন যেন অভিভূত, আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে। কলকাতায় আমাদের প্রকৃতি-সেবন যেন দাগ-কাটা ওষুধ খাওয়া—সেটাও নিয়মিত ঘটে না, ঘটে দৈবাৎ—আর তা-ই সব চেয়ে ভালো কিনা কে জানে। মানুষের মনের কতগুলো মূলগত সংস্কার আছে, কতগুলো প্রবৃত্তিগত বিশ্বাসে তার জীবনের ভিত্তি। আমরা কাজ করি, আমরা গল্প করি; আশা আর যুদ্ধ আর শান্তি নিয়ে আমাদের জীবন। কতগুলো জিনিসের মূল্য আমরা ধ'রেই নিই, তা-ই নিয়ে বাঁচি। কিন্তু রাত্রির অদৃশ্য-কল্লোলিত সমুদ্রের মুখোমুখি, মুহূর্তে সে-সব মূল্য হারিয়ে যায়; শূন্য, শূন্য হ'য়ে যায় মন; কিছু নেই, জীবনে কিছু নেই; আমি ব্যর্থ, আমি নিঃসঙ্গ। কলকাতায় আমার সত্তা নিশ্চিত; সেখানে আমার সব চেষ্টার আর যুদ্ধের মূল্য নিঃসংশয়ে গৃহীত; সেখানকার বাড়ি আর রাস্তা আর রাস্তার মানুষই সেই মূল্যস্বীকারের প্রমাণ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার একটা 'মানে' আছে। সন্ধেবেলা ঘরে বসি, আসে বন্ধুরা, স্রোতের মত পরস্পরের মধ্যে আমাদের সঞ্চার; পরস্পরকে আমরা উদ্দীপিত করি, উজ্জীবিত করি; পারস্পরিক বিশ্বাসে আত্মবিশ্বাস নিবিড় করি; এইটে ভালো ক'রে বুঝি যে আমি আছি, এবং সেই থাকাটা সার্থক। কিন্তু রাত্রির এই অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে একটা হতাশা এই উদ্দাম হাওয়ার মত হা-হা ক'রে ওঠে—আমি নেই, আমি নেই। এই আকাশ আমাকে গ্রাস করেছে, এই অন্ধকার আমাকে গিলে ফেললো, আমাকে ছিনিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলো হাওয়া। কালো-

কালো ডাকাতের মত কালো ঢেউগুলো এলো হৈ-হৈ ক'রে, দরজা ভাঙলো বুঝি, লাফিয়ে উঠলো ওরা হোটেলের ছাদে, লুঠ ক'রে নিয়ে গেলো সব, নিচের তলায় পেট্রোম্যাক্স-জ্বালানো এই ভদ্র চেহারার বাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে গেলো অন্তিম সর্বনাশের বন্যায়। রাত্রে সমুদ্রের জোর আরো বাড়ে কিনা জানি না, হ'তে পারে সেটা আমাদের মনেরই প্রতিচ্ছবি, কিন্তু সত্যি এক-এক সময় মনে হয় সমুদ্র বুঝি লাফিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে উঠে এলো। মনের যে-সব কোন দিয়ে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে নিজের সত্তা আমরা অনুভব করি, সব নিঃশেষে হারিয়ে যায় : নিছক জৈবপ্রাণটা অঙ্গহীন চর্মহীন আদিম জেলি-মাছের মতই অসহায়ভাবে প'ড়ে থাকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে, যখন ঠাকুর রাত্রের খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকে। ঐ খাওয়াতেই যেন ফিরে পাই নিজের সুস্পষ্ট-নির্দিষ্ট সংজ্ঞাসম্ভব মনুষ্যতা।

বিশ্বসৃষ্টির পটভূমিকায় মানুষের সকল কাজই নগণ্য। কথাটা এতই সত্য যে ধরা বুলিই বলা যায়। এটা দর্শন কি বিজ্ঞানের নয়; সাধারণ মানুষের নিত্য অভিজ্ঞতার কথা। কেননা এমন মানুষ পৃথিবীতে বোধ হয় কমই জন্মেছে যে তার জীবনের কোনো-এক দিনে আকাশ ভরা তারার দিকে তাকিয়ে নিজের তুচ্ছতার উপলব্ধিতে অভিভূত হ'য়ে পড়েনি। কিন্তু সে-উপলব্ধি ক্ষণিক, ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। তা না হ'লে উপায় ছিলো না। শঙ্করাচার্য্য জীবনের সর্বব্যাপী ব্যর্থতা উপলব্ধি করলেন, কিন্তু সেই উপলব্ধি প্রচার করবার প্রকাণ্ড ব্যর্থতা তো বুঝতে পারলেন না। মায়ার বশ আমরা সকলেই। যে-মানুষ সন্ন্যাসী হয়, সমস্ত জিনিসের অনিত্যতাই তার মনে ধরা পড়ে; শুধু তার ঐ নির্জন তপস্যার পরম অনিত্যতার বোধ কেমন ক'রে তাকে

এড়িয়ে যায় সে আশ্চর্য্য। যদি কোনো মানুষ সত্যি-সত্যি কখনো তার নিজের অপার অর্থহীনতা সর্ব্বাঙ্গীণভাবে উপলব্ধি করে, তার একমাত্র ন্যায্য পরিণাম হচ্ছে আত্মহত্যা। সে-রকম প্রায় হয়ই না, আর যদি বা হয়, সে-মানুষকে আমরা মহামানব ব'লে শ্রদ্ধা করি না, উন্মাদ ব'লে করুণা করি। প্রকৃতির যে-অদম্য প্রেরণা পৃথিবী নামক গ্রহে প্রাণ নামক আশ্চর্য্য সংঘটন সম্ভব করেছে, তারই একটা কারসাজি এই যে নিজের তুচ্ছতার এই উপলব্ধি নিম্নপ্রাণীতে একেবারে আসবেই না, আর পূর্ণ-বুদ্ধি জীবেরও হবে আংশিক ও ক্ষণিক। একটা-না-একটা বিশ্বাস আছে সকল মানুষেরই জীবনে ; অনেক বিষয়ে মোহমুক্ত হ'য়েও কোনো-না-কোনো জায়গায় প্রকাণ্ড একটা মোহ আমাদের আছেই আছে। সেই মোহই আমাদের জীবনের মূল ভিত্তি ; সেটা না-থাকলে বাঁচতে পারতো না কেউ। যেমন আমি সাহিত্য-রচনা সম্বন্ধে মনে-প্রাণে আস্থাবান। শেয়ারের দালালের কাছে, খেলোয়াড়ের কাছে, 'সোসাইটি'র মেয়ের কাছে এই সাহিত্যরচনা ব্যাপারটা একেবারে অর্থহীন। তাতে অবিশ্যি আমার কিছু এসে যায় না, ঐ সব মানুষদের অবজ্ঞা ক'রে আমি নিশ্চিন্ত, নিজের মোহের মধ্যে সম্পূর্ণ আমি। তবু যদি কখনো ভেবেই দেখি, সমস্ত জীবন ভ'রে আমি যতই লিখি না কেন, আয়ু যেদিন শেষ হবে সেদিন মরবোই, আর সূর্য্য যেদিন নিবে যাবার সেদিন যাবেই, আর সেই তো একদিন হবে পৃথিবীর শেষ। এ-ধরণের ভাবনা সচরাচর মনে আসে না, সে-জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না-দিয়ে পারিনে। আর যখন আসে, সে নিতান্তই ক্ষণিক। তারপর আরো ভাবা যায় : আমাদের এই সূর্য্যমণ্ডলের নির্বাপন সমস্ত সৃষ্টির বিচারে একটা দেশলাইয়ের কাঠির জ্বলা-নেবার মত :

মনে করো প্রতিটি তারা একটি সূর্য্য, আমাদের সূর্য্যের অনেক হাজারগুণ বড়—আর তাও সবসুদ্ধ ক'টাই বা মানুষ জানতে পেরেছে, সব চেয়ে জোরওয়ালা দূরবীক্ষণের নাগালের বাইরে আরো কত আকাশ, আর কোটি-কোটি সূর্য্যের পুঞ্জ-পুঞ্জ উপনিবেশ। আর আমার লেখা, হায়রে!

যদি পুরী হ'তো ইয়োরোপের কোনো সহর, তাহ'লে এই ব্যর্থতাবোধ নিয়ে বিলাস করবার কোনো সুযোগ অবশ্য হ'তো না। তাহ'লে জ্ব'লে উঠতো বীচের প্রান্ত থেকে প্রান্ত কড়া ইলেকট্রিক আলোয়, ভ'রে যেতো আকাশ আমোদলোভীদের কোলাহলে, এখানে ভোজ ওখানে নাচ-বাজনা ইত্যাদি: রইলো সমুদ্রের স্বাস্থ্য, রাজধানীর প্রমোদসুলভতাও বাদ গেলো না। একা লাগবে এমন ফাঁক কোথায়; মন খারাপ করবো এমন সময় নেই। অনেকেই হয়-তো খুসি হবেন, পুরী যদি হঠাৎ একদিন ও-রকম হ'য়ে যায়। বাকি পৃথিবীর চাইতে আমরাও কম 'আধুনিক' নই। হয়তো এটাও সত্যি যে বালুর উপর দিয়ে অনেকক্ষণ হাঁটতে-হাঁটতে ক্লান্ত হ'য়ে হঠাৎ হাতের কাছে একটা ভদ্রগোছের সরাইখানা জুটে গেলে ভালোই লাগে। উল্লসিত হতাম, যদি সমুদ্রের ধারে শুয়ে সমস্তটা দিন কাটিয়ে দেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতো। কিন্তু সে-উল্লাস স্বভাবতই অনেক হ্রস্ব হ'য়ে আসে, যখনই ভাবি যে সেরকম ব্যবস্থা থাকলে সকলেই তার সুযোগ নিতো; এবং সমুদ্রতীর যদি ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মতই মানুষে কিলবিল করে, তবে আর সেখানে শুয়ে থাকবার মজাটা কোথায়? সকলেই যখন একসঙ্গে বীচে শুয়ে সময় কাটাতে আরম্ভ করে, তক্ষুনি দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে ব'সে থাকাই হ'য়ে ওঠে সব চেয়ে রোমাঞ্চকর।

গণ-মনের প্রধান লক্ষণই এই যে অন্য সকলে যা করে তা-ই করতেই ভালোবাসে। জড় হোক্, মৃত হোক্, এই ধরণের মনের একটা সুবিধে এই যে কিসে সে সুখী হবে তা সে নির্দিষ্টভাবেই জানে, সুতরাং সাধ্যমত সে-সুখের অনুধাবনও করতে পারে। ফুটবলের মাঠে আর পোলিটিকাল সভায় গিয়ে যারা হৈ-চৈ করে, আমেরিকান সিনেমা আর ইয়োরোপীয় পানীয়ে যাদের সন্ধ্যা-যাপন ছাঁচে-ঢালা, এটা মানতেই হবে যে জীবনটা তাদের পক্ষে তত বড় সমস্যা নয়। কতগুলো অভ্যাসের সূক্ষ্মযন্ত্রে ঘুরছে তাদের দিন আর রাত্রি; তারা যেখানেই যাবে নিয়ে যাবে সেই অভ্যেসগুলোকে। সুতরাং আজকাল দেখা যায়, যে-সব জনপদকে প্রকৃতিই অপরূপ ক'রে রেখেছে, তাকেও সম্পূর্ণ করেছে মানুষের পানশালা, ক্রীড়াক্ষেত্র আর প্রমোদভবন—আর হোটেলে চরম আরামের ব্যবস্থা—রাজধানীতে যেমন জীবন কাটাই, তিনদিনের ছুটিতে বেড়াতে এসেও ঠিক তেমনটি চাই, হিমালয় কি সমুদ্র যেন ভাড়াটে খুসিকর্‌নেওয়ালা—আমরা যতক্ষণ নাচবো কি খেলবো কি ফ্লার্ট করবো, ওরা অপেক্ষা করতে পারে। কী আশা করতে হবে, তা তারা নিশ্চিত জানে; এবং যা তারা আশা করে তা তারা পায়।

স্বীকার করবো, এ-সুবিধে আমার নেই। বহুলতম প্রচারিত আমোদগুলির প্রতি আমার স্বাভাবিক ও অনিত্যক্রম্য বিতৃষ্ণা। ভোজ যদি বা কখনো হয় লোভনীয়, সার্বজনীন মহোৎসবে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে পাত পেড়ে ব'সে যাওয়ার চিন্তাই আমার পক্ষে অসহ্য। ফলে আমাকে দুঃখ পেতে হয় বেশি। আমার নিজের খুসি নিজেকে তৈরি ক'রে নিতে হয়, এবং মনের হাওয়া সব সময় অনুকূল বয় না। কত সময় অকারণে মন-খারাপ ক'রে

ব'সে থাকি। মনে হ'তে পারে সেটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষ যাতে কখনোই মন-খারাপ না করে, সেইজন্যে আজকালকার বাজারে কত রঙিন মোড়কের ফুর্তি সাজানো।

কিন্তু এ-ও বলি, মানুষের কি মাঝে-মাঝে মন-খারাপ করবার অধিকারও নেই? সুখ তো আমাদের পরের হাতে চ'লেই গেছে, দুঃখী হবার স্বাধীনতাও কি আমাদের থাকবে না? বুকের ভিতর থেকে যেই একটা দীর্ঘশ্বাস উঠলো, অমনি কি গিয়ে বসতে হবে ছবিঘরের ঘেঁষাঘেষির মধ্যে টিকিট কিনে, কি হুইস্কির গেলাস সামনে নিয়ে ক্যাবারে নাচের উরু-প্রদর্শনীতে? কি এই পুরীর হোটেলে সন্ধেবেলাটা যদি 'ডল্' লাগে, ব'সে কি যেতেই হবে লণ্ঠন জ্বালিয়ে একশোয় একআনা হারে ব্রিজ খেলতে? যে-দুঃখ বাস্তব নয়, যে-দুঃখ একটা বিলাস, মনের একটা মেঘ-মায়া, তাকে এত ভয় কেন? সেটাকেই রসিয়ে চেখে দেখা যাক না, সেটাও তো একটা অভিজ্ঞতা। দুঃখেও তো কম রোমাঞ্চ নেই—বিশেষ, সে-দুঃখ যদি হয় পরোক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক। ট্র্যাজিডি আমরা পড়তে ভালোবাসি—সে কি ঠিক এই কারণেই নয় যে তাতে আমরা দুঃখের রোমাঞ্চটা সম্পূর্ণই পাই, আঘাতটা একেবারেই পাই না। এ-ও তো তেমনি, এই যে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনটা হু-হু ক'রে ওঠে—এই অনুভূতিটাকে ধ্বংস করার জন্যে হাজার আয়োজন কি না-করলেই নয়? মনে-মনে গুমরোনো খারাপ, আধুনিক বিজ্ঞানের এইরকম একটা কথা আছে, সেটা 'সুস্থ' নয়। এবং যাতে আমরা একা-একা মনে-মনে গুমরে পীড়িত হ'য়ে না পড়ি, তার জন্যেই আধুনিক সভ্যতার এই বিরাট বাণিজ্য-আয়োজন। সে-জন্যে অবিশ্রান্ত অফুরন্ত উপকরণ

তৈরি হচ্ছে। কিন্তু একটা সন্ধ্যা তাসের জুয়ো খেলে, কি একটা দিন ঘোড়দৌড়ের জুয়ো খেলে কাটানো—সেটা কোন্‌রকমের 'স্বাস্থ্য' তা-ও তো জানিনে। আর তা ছাড়া, মনে-মনে গুম-রোনোটাই বা এমন কী খারাপ? ভেবে দেখতে গেলে, তা থেকেই তো সমস্ত আর্টের সৃষ্টি। তা থেকে আমাদের মনে নানা রঙের ভাবনা আসে—কিন্তু ঐ ভাবনাটাতেই তো আপত্তি। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোক একেবারেই ভাবতে চায় না। এবং যাতে তাদের ভাবতে না হয়, সেজন্যে তারা এই সমুদ্রের ধারে এসে আর কোনো উপায় না পেলে হারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে তাস খেলেই সমস্তটা সন্ধ্যা কাটিয়ে দেবে। যাতে মানুষকে ভাবতে না হয় তার অসংখ্য বিচিত্র ব্যবস্থা যন্ত্র সম্ভব করেছে। এবং তারই নির্ভরে পৃথিবীর বেনেদের কোটিপতিত্ব। তোমরা মন-খারাপ কোরো না, আমাদেরকে অনেক জিনিস বেচতে হবে। আমাদের সব জিনিস কেনো : ভাবনার দায় থেকে বাঁচবে। সেই যে ইংরেজ কবি ব'লে গিয়েছেন 'এ পৃথিবীতে ভাবতে গেলেই দুঃখ,' এই কথার উপরে ভর ক'রেই বিংশ শতাব্দীতে বাণিজ্যের এই আশ্চর্য্য স্ফীতি।

বহু ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, পুরী ইয়োরোপের কোনো সহর নয়। যে-সমুদ্রতীরে আগাগোড়া তাল-পাকানো, খোসা-ছাড়ানো মনুষ্যতার পিণ্ড সেখানে নিজেকে কল্পনা ক'রে কোনোই সুখ পাইনে। মনুষ্যতার দৃশ্য ও সংস্পর্শ এড়াবার জন্যেই মাঝে-মাঝে আমরা বাইরে আসি। কলকাতা থেকে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে পালিয়ে চ'লে আসি—কলকাতারই আর একটি প্রতিকৃতি দেখবার জন্যে নয় নিশ্চয়ই? এখানেও কি সেই সব নগর-ধূসর মুখ, আর নগর-মৃত কথা, আর নাগরিক উল্লাসের অশ্লীল সুড়সুড়ি? ঈশ্বর

আমাদের রক্ষা করুন। কলকাতায়, বাড়িতেই আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নই, আমাদের নির্জনতা অক্ষত নয়। যাতে সম্পূর্ণরূপে একা হ'তে পারি, সেজন্যেই বেরোতে হয় ঘর ছেড়ে। এখানে নির্জনতা। এখানে অন্ধকার। এখানে শান্তি।

৭

আমরা যারা সহরে থাকি, আমাদের পক্ষে অন্ধকারই একটা ঐশ্বর্য্য। কেননা সহরে অন্ধকার ব'লে কোনো জিনিসই নেই। যেখানেই যাই, যে-কোনো অবজ্ঞেয় গলিতে, যে কোনো নির্জন রাস্তার পার্কে—অন্ধকারের শরীরকে খোঁচা-খোঁচা আলো ফুটো ক'রে দেবেই, সে যদি ইলেকট্রিসিটির গভীর ক্ষত না-হ'য়ে গ্যাসের হালকা আঁচড় হয় তাহ'লেই কৃতজ্ঞ বোধ করি। ভাবতে অবাক লাগে যে কলকাতায় সত্যি-সত্যি অন্ধকার একটি ঘরে শোয়া প্রায় অসম্ভব। কলকাতায় অনেক ঘরে আমি ঘুমিয়েছি; এবং তার একটাতেও চোখ না-বুজলে অন্ধকার নামেনি। ঘরের আলো নেবাতেই কোনো-না-কোনো জানলার ফাঁক দিয়ে রাস্তার আলোর একটি-না-একটি তির্য্যক রেখা এসে পড়েইছে—ঠিক আমার চোখ লক্ষ্য ক'রে। পরদা দিয়ে তাকে হয়তো চাপা দিতে পেরেছি, বাধা দিতে পারিনি। সময়ে মানুষের সবই নাকি স'য়ে যায়, কিন্তু এই একটা কষ্ট এ পর্য্যন্ত তো আমার সহ্য হ'লো না। যেখানেই যাই—যানে আর পথে, ঘরে আর বাজারে—সেখানেই তো আলোর তীব্র চীৎকার; সকল কাজের শেষে যখন ঘুম, তখন অন্তত সে-কলরোল স্তব্ধ হোক, নামুক অন্ধকার। যে-অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, তাতে চোখ আর মন ডুবিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকা—এ যেন অতি বিরল, দুর্মূল্য বিলাসিতা, আমার পক্ষে তা আশা করাই অন্যায়। আলোর উল্কি-আঁকা এই

ফ্যাকাশে ছায়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু আছে এ প্রায় ভুলেই গিয়েছি, এমন সময় একদিন টিকিট কিনে রেলগাড়িতে চেপে বসলুম। গাড়ি ছাড়লো ; ইষ্টিশানের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে গাড়ি যেই এলো আকাশের তলায়, অমনি চারিদিক থেকে নিবিড় নীরন্ধ্র অন্ধকার উঠলো কথা ক'য়ে। কালো, কালো। কতদিন পর যেন মনে পড়লো, পৃথিবীতে এ-জিনিসও আছে। সে-অন্ধকার অতি উজ্জ্বল আলোর মতই মনকে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। হাওয়া ছুটে যাচ্ছে কান ঘেঁষে তীরের মত শিষ দিয়ে, হঠাৎ এক ঝাঁক জোনাকি ঝিলকিয়ে মিলিয়ে গেলো, আমরা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছি চুপ ক'রে।

চিল্কার ধারে গিয়ে আমরা নতুন চাঁদের দেখা পেলুম। আসন্ন সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমাদের প্যাসেঞ্জার গাড়ি চলেছে যেন নতুন চাঁদের বাঁকা রেখাকেই লক্ষ্য ক'রে। এ-সব গাড়িতে বড় ভিড় হয় না, আমাদের কামরাতে আমরা ছাড়া আর-একজন ভদ্র-লোক। আমরা যেদিকে বসেছি, সেদিকেই চিল্কা। প্রায় দু'ঘণ্টা ধ'রে চিল্কা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে এলো, ছ'টা ষ্টেশন পার হ'য়ে। কখনো দূরে ঝাপসা সাদা পাতের মত, কখনো আরো কাছে, কখনো একেবারে রেল-লাইনের তলায় ছড়ানো। দিগন্ত-ছোঁয়া শান্ত, নিশ্চল জল ; মাঝে মাঝে দ্বীপ, পাহাড়। গাড়ি যত এগোচ্ছে, দু'দিকে পাহাড়ের সংখ্যা ততই বাড়ছে। উড়িষ্যা পার হ'য়ে মান্দ্রাজের সীমানায় ঢুকলুম। এ-গাড়ি ওয়াল্ট্যায়ার যাবে। আমরা যেখানে নামবো তার নাম রম্ভা। সেখানে চিল্কার শেষ। ব'সে আছি টাইম-টেবল চোখের সামনে খুলে, নির্ভুল নিয়মে একটার পর একটা ষ্টেশন আসছে। উৎকণ্ঠায় আছি, কখন্ রম্ভা এসে ছাখ্-না-ছাখ্ পালিয়ে যায়। ছোট

ষ্টেশন, গাড়ি হয়তো দাঁড়িয়েই দৌড় দেবে, ঠিকমত নামতে পারবো তো ? কুলি জুটবে কিনা কে জানে। বাক্স বিছানা ইত্যাদি যাবতীয় সম্পত্তি হাতের কাছে জড়ো ক'রে ব'সে আছি। এদিকে সন্ধে তো হয়-হয়। পুরীর হোটেল থেকে যতটা খবর সংগ্রহ করতে পেরেছিলুম, বিশেষ ভরসা পাচ্ছিনে মনে। ডাকবাংলো একটা আছে শুনেছি, কত দূরে কে জানে। রাত্রের মত একটা বাসস্থান হ'লেই হয়, চাল ডাল আলু সঙ্গেই আছে।

সন্ধে হ'লো। চিল্কার প্রসার দুধের মত ম্লান। জলের উপরে পাখির ঝাঁক। স্বচ্ছ নীল আকাশে নতুন বাঁকা চাঁদ প্রকাণ্ড একটা মুক্তার মত জ্বলছে। দু'ধারে নিবিড় সবুজ গাছপালা, ছোট-ছোট পাহাড়। একটু আগেই আমরা কথা বলছিলাম, এখন আমরা চুপ। আমরা অপেক্ষামান, এর পরেই রম্ভা।

যতটা তাড়াহুড়ো ক'রে নামলুম তার কিছুই দরকার ছিলো না। এটা জল নেবার জায়গা, গাড়ি চার মিনিট দাঁড়ায়। যে-লোকটি আমাদের মাল নামালো, তাকে ষ্টেশনের কুলি ভেবেছিলুম, কিন্তু সে ডাকবাংলোরই পরিচারক। আর-একজন লোক, লম্বা, মস্ত গোঁফ, মস্ত লালচে দাঁত—গাড়ি থামবার সঙ্গে-সঙ্গেই লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে আমরা ডাকবাংলোয় যাবো কিনা। যাবো কিনা ! সন্ধ্যার অন্ধকারে এই শূন্য জনপদে পা দিতে-না-দিতেই যে আস্ত একজন দূত মিলে যাবে তা আমরা কখনোই আশা করিনি। জিজ্ঞেস করলুম 'ডাকবাংলো কতদূর ?' লোকটা বললে 'নগিজ,' অর্থাৎ কাছে। হেঁটে যাওয়া যাবে ? লোকটা মাথা নাড়লো। সন্দিগ্ধ মনে ষ্টেশন থেকে বেরোলাম। দূরত্ব সম্বন্ধে এদের ধারণা অতি অস্পষ্ট, সে-অভিজ্ঞতা

আগেই হয়েছিলো। তা ছাড়া, পনেরোকুড়ি মাইল হাঁটা-হাঁটি করা যাদের পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, কতটা দূর হেঁটে যাওয়া যায় সে-বিষয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের মতদ্বৈধ হওয়াও খুবই স্বাভাবিক। ভয়ে-ভয়েই এগোতে লাগলাম, কিন্তু ভালো ক'রে হাঁটতে আরম্ভও করিনি এমন সময় আমাদের পথপ্রদর্শক হঠাৎ একটা বারান্দায় গিয়ে উঠলো। এই বাড়িই যে ডাকবাংলো সেটা উপলব্ধি করতে রীতিমত সময় লাগলো আমাদের। গাড়ি থেকে নেমেই আবছা চোখে পড়েছিলো বাড়িটা। কল্পনাও করতে পারিনি ঐ বাড়িই আমাদের সাম্প্রতিক ভবন। নগিজ মানে যে সত্যি-সত্যি এত কাছে তা কে জানতো!

এ ক' ঘণ্টার এত আশঙ্কা মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো, বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে গভীর নিঃশ্বাস ছাড়লাম। ক্ষীণ, ক্ষীণ চাঁদ এরই মধ্যে গাঢ়-তামাটে হ'য়ে আকাশের ঢালু বেয়ে নিচে নেমেছে, আর তার আলো নেই। অন্ধকার আকাশে ঝাঁকে-ঝাঁকে তারা উঠেছে। ট্রেনটা এখনো দাঁড়িয়ে। দরজা খোলা হ'লো, যে-ঘরটিতে আমরা ঢুকলুম তা একসঙ্গে বসবার শোবার ও খাবার ঘর। তিনদিকে খোলা বারান্দা, পাশে অকৃপণ বাথরুম, কিছুরই অভাব নেই। সেই মুহূর্তে মনে হ'লো এ যেন দুর্লভ কল্পনার অন্তঃপুর; বহু পুণ্যফলে এখানে প্রবেশ পেয়েছি।

দীর্ঘ গুম্ফবান পুরুষোত্তম আমাদের জানালে যে এখানে প্রায়ই লোকজন আসে, এবং 'কালকেও দুটো বাবু এথেথিলো।' এখন আর-কেউ নেই তো? কিছু চেষ্টা ক'রে জানা গেলো যে এখানকার বাসিন্দা শুধু আমরাই। এটাও ঈশ্বরের দয়া বলতে হবে। বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুরে পথে-বিপথে

অজস্র ডাকবাংলো ছড়ানো, যে-কোনোটাই এত সুন্দর, দেখলে মনে হয় চিরকাল থাকি। কিন্তু নির্জনতা ও গোপনতাই এদের প্রধান আকর্ষণ। অন্য মানুষের সান্নিধ্যে সমস্ত সুরটাই কেটে যায়। ট্রেন কখন্ চ'লে গেছে, চারদিক নিঃঝুম, পৃথিবীতে এই একটি ঘর, আর ঘরের মধ্যে আমরা—এ ছাড়া আর-কিছু নেই। এ-ক'দিন পুরীতে অবিশ্রান্ত সমুদ্রের চীৎকারের পরে এ-স্তব্ধতা আরো অদ্ভুত লাগলো—এ যেন একটা উপস্থিতি, একটা সজীব অনুভূতি, বুকের মধ্যে রক্তের যেন স্পন্দন। দরজার বাইরে কে যেন আমাদের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে, চিরকাল। অনেক, অনেক দূরে দিনের আর রাত্রির কলরোল। এই মুহূর্ত্ত ছাড়া আর-কিছু নেই।

খোলা হ'লো বাক্স-বিছানা, দেখতে-দেখতে আমাদের ব্যবহারের কত জিনিস ঘর ভ'রে ছড়িয়ে গেলো। এখানে চায়ের কৌটো, ওখানে সাবান ; এরই মধ্যে চিরুনিটা আবার হারালো কোথায় ? এখানেই আমরা ঘর বেঁধেছি। আধ ঘণ্টা আগে আমাদের পক্ষে যে-ঘরের অস্তিত্বই ছিলো না, এখন মনে হয় এখানে যেন আমরা কতকাল ধ'রে আছি, যেন চিরকাল থাকবো। তালা-বন্ধ ঘর ছিলো ডানা-মোড়া পাখির মত, মুহূর্ত্তে পাখা মেলে আমাদের ভিতরে টেনে নিয়েছে। আমরা এখন ওর। আমরা ওকে ভরেছি, শুধু আমাদের জিনিস দিয়ে নয়, আমাদের সত্তা দিয়ে। টেবিলের উপর ছোট ষ্টোভে চায়ের জল গরম হচ্ছে, অনেকক্ষণ লাগবে। পুরুষোত্তম গেছে মুর্গি আনতে, ও রাঁধতে পারে।

উড়িষ্যায়, দেখা গেলো, অতি সহজেই নবাবের মত থাকা যায়। যে-কোনো ডাকবাংলোয় আপনি যান, ভৃত্য একাধিক,

আজ্ঞাপালনে ক্ষিপ্র ও অক্লান্ত, এবং সন্তোষসাধনে উৎসুক ও সচেষ্ট। তার উপর, যে রকম পারিতোষিক তারা প্রত্যাশা করে সেটা ভয়াবহ তো নয়ই, বরং সামান্যই। যে-লোকটি গাড়ি থেকে আমাদের মাল নামিয়েছিলো তার নাম কী চেহারা কেমন কিছুই আমার মনে নেই, কিন্তু যে দু'দিন ছিলাম, সে আমাদের সেবায় নিজেকে যে-ভাবে নিয়োজিত করেছিলো সেটা ভুলবো না। তার ভাবখানা এমন, আমরা তার গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে সে খুসি হয়। সে পা টিপে দেবে, তেল মেখে দেবে, নখ কেটে দেবে—কী না করবে ? আমাদের দেশের ভূসম্পত্তি, বানদের জন্য এ-সব পরিচর্য্যা। আমি অতি কষ্টে মধ্যবিত্ত-ও-সমস্ত আমার অভ্যেস নেই। নিজের শরীরটাকে একটু নাড়লেই যেখানে হ'য়ে যায়, সেখানে চাকরকে হুকুম করতে আমি পারি না। আর সুস্থ অবস্থায় শারীরিক সেবা ভৃত্য কেন—কারো হাত থেকে নিতেই আমি স্বভাবতই কুণ্ঠিত। সুতরাং আমার আদেশস্বল্পতায় লোকটি প্রথমটায় বুঝি বিব্রতই হয়েছিলো। নিজের হাতে চেয়ারটা একটু সরালে সে হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে আসে। এতে আমার চ'টে যাবারই কথা, কিন্তু চটলে তার উপর নিষ্ঠুর অবিচার করা হ'তো। অগত্যা, তারই মনের শান্তির জন্য আমাকে সায় দিতে হ'লো। সে যা-কিছু করতে চাইতো, আমি আপত্তি করতুম না। চিল্কায় নৌকোয় বেড়াবার সময় দু'ঘণ্টা সে আমাদের মাথার উপর ছাতা ধ'রেই রইলো। ঘোরতর অস্বস্তি বোধ করছিলুম, কিন্তু দু'একবার বারণ করাতে সে এমন দুঃখীর মত করুণ মুখ করলো যে আবার বারণ করতে প্রাণে সইলো না। যদি তার হাত থেকে জোর ক'রে ছাতা কেড়ে নিতুম, মনের দুঃখে সে বুঝি হ্রদের জলেই ঝাঁপ দিতো। কাজে-

কাজেই এ দুটো দিন রইলো আমার সাহিত্যিক জীবনের কালো খাতায় নবাবির লাল কালিতে লেখা হ'য়ে।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই বাইরে এলুম। ঝিরঝিরে সকাল, বাতাসে ঘাসের গন্ধ নেশার মত। এক কোণ থেকে দেখা যায় চিল্কার একটুখানি জল, আর দূরে সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে সূক্ষ্ম ধোঁয়ার মত কুয়াশা। পাহাড়ের এই ইষ্টিশান থেকেই হঠাৎ রেল-লাইন একটা পাহাড়ের পা ঘেঁষে বেঁকে গেছে। ওদিকে তাকালে হঠাৎ চোখ আটকে যায়, তারপর অবাক লাগে। কোথায় গেছে রেল-লাইন, কত দূরে, কত পাহাড় ডিঙিয়ে, কত নদী পার হ'য়ে, হয়-তো সমুদ্রের ধার দিয়ে। ছোট ছেলের মত অবাক লাগে। শিশুর জীবনের প্রধান অনুভূতি বিস্ময়, কেননা সে অজ্ঞান। আমরা অনেক জেনে ফেলি ব'লে বিস্ময়টা ঠিক সেই মাত্রাতেই ক'মে আসে। তা ছাড়া, বিজ্ঞতার একটা দম্ভ থাকে এই যে কিছুতেই অবাক হ'বো না। অবাক হ'লেই যেন বিস্ময়ের পাত্রের কাছে ছোট হ'য়ে গেলুম। একবার একটি ছোট ছেলে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলো। সে এর আগে কলকাতায় আসেনি, কিন্তু সমস্ত সহর বেড়িয়ে যে-কোনো জিনিসই সে দ্যাখে, অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলে : 'ওঃ এর আর কী ! আমাদের—গঞ্জেও এ-রকম কত আছে !' পাছে আমরা তাকে 'বাঙাল' মনে করি, এই ছিলো তার ভয়; এবং সেই ভয়ে কলকাতার যে-মহিমায় তার বালকচিত্ত অভিভূত হওয়া উচিত ছিলো তাকে সে মোটে আমলই দিলে না। ঠকলো সে-ই। আমরা বড়রাও অনেক সময় ঐ রকম একটা বিকৃত একগুঁয়েমির ভাব মনের মধ্যে শানিয়ে নিই; আত্ম-সচেতনতার কণ্টকিত বেড়া তুলে সহজ

বিস্ময়কে রাখি আটকে। যে-কোনো উপলক্ষ্যেই আত্ম-বিস্মৃত আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়াটা কাঁচা মনের লক্ষণ ব'লেই প্রসিদ্ধি। এতে লোকসান আমাদেরই, মস্ত একটা রসের জোগান বন্ধ হ'য়ে যায় আমাদেরই মনে। এ-কথা অস্বীকার করবো না যে জীবনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা আমাদের আত্ম-রক্ষার বর্ম, সেটা বাদ দিতে গেলে বিপদ অনেক। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রের বাইরে রয়েছে আমাদের অনুভূতির বিশাল জীবন: কতগুলো দৃশ্য আর গন্ধ, কতগুলো ভাব আর কল্পনা আমাদের মনে বিশেষ এক ধরণের প্রতিক্রিয়া আনে—আমরা স্পন্দিত হই, অনুরণিত হই, হই মর্মরিত আর রোমাঞ্চিত। সেখানে হার মানাই ভালো, সেখানে নিজেকে দিতেই হয়। হ'তে হয় শিশু: তার আদিম নিঃসীম রহস্যবোধ নিয়ে। উন্মুখ বিস্ময়ের কাছে নিজেকে নিঃসঙ্কোচে দিতে পারলে আমরা চ'লে যাই সংজ্ঞার সীমানা ছাড়িয়ে নতুন এক জগতে; সে-জগত শিশুর চিরন্তন রূপকথার, বস্তু ও সত্য সেখানে কল্পনার আলোয় রূপান্তরিত। এই সংস্পর্শের আলো যখন জ্বলে তখন সমস্ত পৃথিবীকে আমরা যেমন নিবিড় ও একাগ্র ক'রে পাই তেমন আর কখনোই পাইনে। এ-কথা বলার অর্থ অবশ্য এ নয় যে জ্ঞান বর্জনীয়, এবং শিশুর সর্বাঙ্গীণ অজ্ঞতাই আদর্শ অবস্থা। এ-কথা বলাই বাহুল্য যে শিশুর মধ্যে যে-অজ্ঞতা মধুর, সাবালক মানুষে সেটা জড়তা। তবে বিস্ময় আমাদের জীবনের একটি অমূল্য রস-উৎস; এবং বয়ঃক্রম ও অভিজ্ঞতা বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে এই বিস্ময়-চেতনা অনেক ক'মে আসে, জীবনও আসে ঠিক সেই অনুপাতে ক্ষীণ ও পাংশু হ'য়ে। সেটা শোচনীয়। এ-জন্যে দায়ী জ্ঞান নয়, জ্ঞানের দম্ভ।

ভেবে দেখতে গেলে, জ্ঞানের সঙ্গে বিস্ময়ের কোনো বিরোধ নেই : বরঞ্চ এটা বললেই সত্য হয় যে আমরা যত বেশি জানি, তত বেশি অবাক হই। যেমন ধরা যাক, বস্তুবিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানের মর্মে কিছুটা প্রবেশ করতে পারলে জড় ও জীব নিয়ে প্রকৃতির অফুরন্ত বিচিত্র লীলা আমাদের মনে হয় আরো কত অপরূপ রহস্যময়। জ্ঞান ও বিস্ময়ের এই যে সমন্বয় এটা জীবনের একটা প্রধান সাধনা।

এমনি শিশু হ'য়ে যেতে হয়, এমনি স্বচ্ছ সহজ বিস্ময়ে মন ভ'রে যায়, এই চিল্কার ধারে, এই সকালবেলায়। এতখানি আকাশ একসঙ্গে দেখতে পাওয়া জীবনের একটা দুর্লভ সম্পদ—আর এমন আকাশ, এমন আশ্চর্য্য নীল। ছোট্ট এই রম্ভা ষ্টেশন : তা ছাড়া আর কোনোখানে কিছু নেই। সেখানে ঘণ্টা বাজে। সকালবেলা মান্দ্রাজ মেল এসে দাঁড়ায়। আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি ; লম্বা রেলগাড়ি আর জানলায় জাগরণ-ক্লান্ত মুখগুলি ছবির মত। ওরা যেন অন্য জগতের বাসিন্দা। ওরা যেন ছায়ার দল, হাওয়া ওদের নিয়ে চলেছে ঝেঁটিয়ে। মোটেও ওদের সত্য মনে হয় না। ঐ চললো গাড়ি, গেলো মুখগুলি মিলিয়ে। কয়েক মিনিট চারদিক ভ'রে উঠেছিলো ফিরিওয়ালার ডাকে, বেচাকেনায়, কথাবার্ত্তায়—আর ঐ মস্ত রেলগাড়িতে—আবার এখন সব চুপ, সব শূন্য, এঞ্জিনের ফোঁসফোঁসানিও আর শোনা যায় না। হঠাৎ একটা ছায়া পড়েছিলো, ছায়া মিলিয়ে গেলো। আবার নিটোল হ'য়ে এলো আলো-ভরা স্তব্ধতা। সন্ধেবেলা আবার মান্দ্রাজ মেল আসে—এটা যাবে হাওড়া। ছুটে আসে সবুজ সার্চলাইট, অন্ধকার আহত সাপের মত কাৎরিয়ে ওঠে। গাড়ি এসে দাঁড়ায় ; কেউ ওঠে না, কেউ নামে না ; যাত্রীরা

ষ্টেশনের নামটাও লক্ষ্য করে না হয়-তো ; ওরা কেউ জানে না যে পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর জায়গা এ-ই, এবং আমরাই একে খুঁজে বার করেছি। একটু পরে শুধু একটা দীর্ঘ, মন্থর শব্দ ; তারপর চুপ। আর রেলগাড়ি যেখানে দাঁড়িয়েছিলো ঠিক তার উপরে, ঠিক রেল-লাইনের বাঁকের মাথায় তৃতীয়ার চাঁদ। সন্ধের পর অল্প খানিকক্ষণ কুয়াশার মত পাৎলা আলো—আলোর একটু ছলছলানি, যেন পৃথিবী-ভরা কোনো স্মৃতির অস্পষ্টতা। তারপর রাত বাড়লো, হঠাৎ বাইরে এলাম। চাঁদ নেই ; বিশাল অন্ধকার আকাশ জ্বলন্ত তারায়-তারায় নিঃশ্বসিত।

এখানে, এই সবুজ হ্রদের ধারে
যেন অনেকদিনের হারানো কোনো বন্ধুকে ফিরে পেলুম—
ঠিক বুঝতে পারছি না, কে।

বুঝতে পারছি না।
বুঝতে যে পারছি না সেটাই তো ভালো।
শুধু বুকের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আনন্দ, আবছায়া ভয়—
যেন নতুন স্ত্রী খুলে ফেলছে তার সাজ
রাত্রির অন্ধকারে, হাতের চুড়ি বাজিয়ে ;
অন্ধকারে ব'সে শুনছি।

কী যে হারিয়েছিলাম, কী যে ফিরে পেলাম।
সে কি এই স্তব্ধতা,
কলকাতার ট্র্যাফিকের গর্জন আর সমুদ্রের গর্জনের পরে
এই জীবন্ত, ভীষণ স্তব্ধতা ?
সে কি এই তারায় ছাওয়া আকাশ,
না কি নতুন চাঁদের বাঁকা রেখা,
না কি ঐ যে রেল-লাইন বেঁকে গেছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে
তারই দিগন্ত ইঙ্গিত ?

এই শুধু জানি, সমস্ত বুক আমার ভ'রে গেলো
এখানে, এই হ্রদের ধারে।
তাকিয়ে-তাকিয়ে পলক পড়তে চায় না চোখের—
আকাশ ভ'রে এত তারা সাজানো।

আমি চঞ্চল হে

একটু পরে মান্দ্রাজের গাড়ি এসে দাঁড়াবে
চাকায়-চাকায় স্তব্ধতাকে আগে-আগে ঝেঁটিয়ে ;
কাল ভোরে সে কলকাতায়।
কিন্তু কলকাতা এখন কতদূরে
কলকাতাও কতদূরে এখন।
কতদূরে এই মাত্র শেষ হওয়া যুদ্ধের ঝননা।

৮

কালো-কালো মাঝিরা গল্পে মশগুল। তাদের ভাষা আমরা বুঝি না। যেন বানরের কিচির-মিচির। বানরের মতই সাদা ওদের দাঁত। ওরা দিয়েছে পাল তুলে, নৌকো ছলছলিয়ে এগিয়ে চলেছে। ঐ দেখা যাচ্ছে গাছে-গাছে সবুজ দ্বীপ, আমরা চলেছি সেখানে। এমনি আরো কত দ্বীপ চিল্কার বুকে ছিটোনো। ওদিকের দ্বীপটা একটা পাহাড়, সেখানে আছে দেবাশ্রিত 'গুম্ফ'। ফেরবার পথে সেখানেও যাবো আমরা। সামনের দিকে তাকালে কূল নেই ; ঐদিক দিয়েই চিল্কা মিশেছে সমুদ্রে, যদি বরাবর নৌকোয় চ'লে যাই পুরী গিয়ে পৌঁছতে পারবো। অনেক দূরে হ্রদের আর সমুদ্রের সঙ্গম, বড় ইচ্ছে করে দেখে আসি, দেখা হবে না। দূরের দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়, এত আলো। যেন আকাশের আলো জল হ'য়ে বিছিয়ে গেছে। কাছের জল ফিকে সবুজ, বেশি গভীর নয়। নিচু হ'য়ে তাকালে তলাকার মাটি প্রায় দেখা যায়। স্বচ্ছ, শান্ত। আমাদের বাঁ দিকে তীর খুব কাছে, সেখান দিয়ে গেছে রেল-লাইন। হঠাৎ চেয়ে দেখি, একটা রেলগাড়ি চলেছে, খেলেনার মত ছোট্ট—কী আশ্চর্য্য, একটু শব্দ করছে না। আর এত আস্তে চলেছে, প্রতিটি চাকা যেন গোনা যায়। চিল্কার উপর দিয়ে নৌকোয় যেতে-যেতে ঐ লাইনে বাঁধা খেলেনা-গাড়ির উপর বড় করুণা হ'লো—কত কষ্টে ধুঁকতে-ধুঁকতে চলেছে,

বেচারাকে পৌঁছতেই হবে। আমাদের পৌঁছবার তাড়া নেই, আমরা চলেছি। হাওয়ায় জুড়িয়ে গেলো শরীর। আমাদের শরীরে বিশ্রামের শান্তি, আমাদের চেতনা এই শান্ত জলের মত দিগন্তে প্রসারিত। আমাদের শরীর আর নেই—এই অফুরন্ত আকাশের নিচে, এই স্বচ্ছ জলের উপরে। এই যে নৌকোটা একটু-একটু দুলছে, আমরা সেই দোলা। জলের উপরে আমরা প্রজাপতি। বাতাসে পাখি আমরা। শিশিরে-ছোঁয়া হাওয়ায়-ধোয়া এই সকালবেলা—এ আমাদের।

চিল্কার এ-জায়গাটা গভীর, এখানে ছোট-ছোট ঢেউয়ের খেলা। ওগুলো কী? বাচ্চা হাতির মত গোলগাল, ফিকে বেগনি রঙের, এই তুলছে মাথা, এই দিচ্ছে ডুব, পেট উঁচিয়ে ভেসে উঠছে নৌকোর কাছে। বেজায় ফুর্তিবাজ, সঙের মত কেবলি ডিগবাজি খাচ্ছে। ভারি মজা তো। কী ওগুলো? মাঝিরা বললে: মগর মাছ। মগর মানে অবিশ্যি মকর, এবং মকর মানে মাছ; সুতরাং সমস্যার সমাধান হ'লো না। মাছ তো ওরা নয়, বরং কোনো সামুদ্রিক জানোয়ারের ছোট ও নিরীহ সংস্করণ। কবে একদিন কোনো-এক দুর্ঘটনার তাড়ায় এক ঘর ছিটকে পড়েছিলো সমুদ্র থেকে; তারপর চিল্কার এক অপেক্ষাকৃত গভীর অংশে তাদের সন্ততি প্রতিবেশীহীন প্রতি-যোগিতাহীন নিশ্চিন্ততায় খেলা ক'রে দিন কাটাচ্ছে। বিপদের অভাবে ক্রমশ ছোট হ'য়ে গেছে তাদের শরীর, তাদের চেহারা থেকে ভয়ঙ্কর ভাবটা আস্তে-আস্তে ক'মে গিয়ে এখন নেহাৎই কমিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আরো কিছুকাল পরে আরো ছোট হবে এরা, তারপর একদিন এদের শেষ বংশধর হয়-তো এই জলে ডিগ্‌বাজি খেতে-খেতে হঠাৎ ধরা পড়বে মানুষের জালে।

ঐ একটুখানি জায়গা পার হ'য়ে এসেই এদের দেখা আর পাওয়া গেলো না। বোঝা গেলো, এদের সঙ্কীর্ণ জগতের সীমানা অতিশয় নির্দিষ্ট। এত জলের মধ্যে ঐ একটু জায়গাতেই এরা যে ব'য়ে এনেছে সামুদ্রিক জীবনের স্মৃতি—এ নিশ্চয়ই নিতান্ত একটা দৈবঘটনা, এর মূলে রয়েছে প্রকৃতির তেমনি কোনো ব্যতিক্রম যার ফলে কখনো প্রাণের কোনো শাখা হঠাৎ নানা বৈচিত্র্যে পল্লবিত হ'য়ে ওঠে, আবার অন্য-কোনো শাখা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায় ম'রে। যাকে এভল্যুশন বলি তা তো সত্যি একেবারে মাপাজোকা ছকে-আঁকা একটা ক্রমবিকাশী নিয়ম নয়; তাতে অ্যাক্সিডেন্টের অংশ যে কত প্রধান ভাবলে অবাক হ'তে হয়।

পথ প্রায় শেষ হয়েছে; সরু লম্বা সবুজ দ্বীপটা বৃহৎ রোদ-পোয়ানো সরীসৃপের মত হঠাৎ যেন গলা বাড়িয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। নৌকো ঠেকলো মাটিতে, মাঝিরা আমাদের পাঁজাকোলা ক'রে নিরাপদ মাটিতে নামালো। রোদ চড়েছে, আমরা ক্লান্ত। সঙ্গের লোক বলছে: 'ঐ তো রাজার প্যালিস, চলুন ওখানে।'

না, রাজার 'প্যালিস' আমরা পরে দেখবো, আগে দ্বীপটা ঘুরে আসি। সত্যি-সত্যি দ্বীপ। চারদিকে যার জল। চওড়ায় এত ছোট যে এক দৌড়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চ'লে যাওয়া যায়। সমস্ত দ্বীপটা মস্ত একটা উপবন গোছের, ঘন গাছপালা ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে সরু পরিষ্কার রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে গেলুম অন্য প্রান্তে, জলের ধারে নেমে এসে মাটিতে বসলুম একটু বিশ্রাম করতে। আমাদের পায়ের কাছে অনেক নুড়ি ছড়ানো, পাড়ে কয়েকটা নৌকো বাঁধা, এখানে চিল্কার কেমন অদ্ভুত তিন-কোণা চেহারা। জায়গাটি ঠিক যেন সিনেমার

ছবি থেকে তুলে আনা ; ঠিক সিনেমার গল্পে নৌকাডুবি হ'য়ে ভেসে এসে ওঠবার মত জায়গা। ধরা যাক, আমরাই যদি কোনো দুর্লভ দৈবক্রমে হতাম এই দ্বীপের প্রথম আবির্ভাব। এ-মাটিতে প্রথম মানুষের পা পড়লো আমাদের, এ-বাতাসে আমাদের স্বরে বাজলো প্রথম ভাষা। হায়রে, কাছাকাছি এইরকম একটা ছোটখাটো দ্বীপও কি এখন পর্য্যন্ত অজ্ঞাত থাকতে নেই! তাহ'লে সেটা আবিষ্কার ক'রেও তো কিছু করতে পারতুম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বড় দেরি ক'রে জন্মেছি, আমার জন্যে কিছু আর বাকি নেই। যেখানেই মাটি আছে সেখানেই মানুষের পা প'ড়ে গেছে অনেক আগে ; পৃথিবীর সকল জলের উপর দিয়ে ভেসেছে মানুষের বাঁধা তক্তা। যেখানে হয়তো এখনো পা পড়েনি, অতি দুর্গম সেই মাটি, পথ সঙ্কটে সঙ্কুল : এটা নিশ্চিতই জানি সেখানে যে-পা প্রথম পড়বে, সে আমার নয়। ঘরে ব'সে কাগজে মাথা ঠেকিয়ে কালির আঁচড় কেটে-কেটে আর তার ফলে কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগে-ভুগেই এ-জীবনটা কাটলো, আর-কিছু হ'লো না।

ফেরবার মুখে 'প্যালিস' দেখা গেলো। চমৎকার বাড়ি ক'রে রেখেছেন খালিখোটের রাজা, আমাদের ডাকবাংলোটিও তাঁর। ভিতরটা চমৎকার আসবাবে সাজানো। রাজার অনুমতি নিয়ে এখানে একরাত্রি থাকা যায়। স্পষ্ট বোঝা গেলো, রবিনসন ক্রুসোর নয় এ-দ্বীপ। এই সিনেমা-দ্বীপের মধ্যে হঠাৎ এই সৌখিন ভবন, চৌরঙ্গির আসবাবে সাজানো। সিনেমাই বটে। বেশ ভাবতে পারি, কোনো আমেরিকান ছবিতে নায়ক-নায়িকা কোনো নামহান সুদূর দ্বীপে পরিত্যক্ত হ'য়ে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ এমনি একটি ফিটফাট বাড়ি আবিষ্কার ক'রে ফেললো, সাদর অভ্যর্থনা নিয়ে প্রস্তুত। আর তারপর হয়-তো দেখা গেলো

সে-বাড়ির কর্ত্রী আর-কেউ নয়, নায়কের বহুকাল নিরুদ্দিষ্ট অবিবাহিতা পিসি। বাকিটা এক নিঃশ্বাসে বলা যায়: বুড়ি মরলো, রেখে গেলো একমাত্র ভাই-পোকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি, দীর্ঘ চুম্বনে ছবি হ'লো শেষ।

এবার ফিরতে হবে, মাঝিদের তাড়া দিতে হ'লো। তারা 'প্যালিসে' ঢুকে দিব্যি গুলজার। জাঁকিয়ে বসেছে এক-একজন চেয়ারে, কেউ সিগারেট ফুঁকছে, কেউ পা তুলে দিয়েছে টেবিলে; একজন ওদের মাতৃভাষার খবরের কাগজ প'ড়ে শোনাচ্ছে আর সকলকে, আর মাঝে-মাঝে আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে নানারকম মুখবিকৃতি করছে। এই রাজা-উজির খেলা ফেলে চট্ ক'রে উঠে আসবে না ওরা। আমাদের দেখে উৎসাহটা স্বভাবতই কিছু বাড়লো; আরো চড়লো কাগজ-পড়ুয়ার সুর। এ-যাত্রায় সায়েব-বাড়ির আসবাব সার্থক করলে ওরাই।

বেলা বেড়েছে, রোদ চড়েছে। আমাদের বেরুতেই দেরি হ'য়ে গিয়েছিলো, এখন আমাদের মন নুয়ে-পড়া নিশানের মত। সেই গুম্ফে যাওয়া আর হ'লো না: হ্রদের বুকে পাহাড়ের গুহার চাইতে অন্নজলের আকর্ষণ এখন আমাদের মনে প্রবল। এতক্ষণে পুরুষোত্তম নিশ্চয়ই খাবার সাজিয়ে দণ্ডকারণ্যে সীতার মত প্রতীক্ষায় ব'সে আছে; আর চিল্কার মাছ এতই সুস্বাদু যে গুম্ফবান পুরুষোত্তমের রন্ধন-প্রণালীও তাকে নষ্ট করতে পারে না।

চিল্কার কথা ভাবতে গিয়ে হ্রদের চাইতে রম্ভার ডাকবাংলো আর ইষ্টিশানের কথাই বেশি মনে পড়ে। আমরা ভ'রে গিয়েছিলাম তাতেই, হ্রদ ছিলো বিচ্ছিন্ন পটভূমিকা। এ-জায়গাটি আর ডাকবাংলোর ঘরটিই যেন এমন যে ভোরবেলা চোখ মেলে

তাকিয়েই মনে হ'লো, এখানেই থাকবো চিরকাল। সেদি
বিকেলের গাড়ি তাই আমাদের না-নিয়েই খুরদা রোডে গিয়ে
পৌঁছলো। দরজা-বন্ধ ঘরে শুয়ে-শুয়ে শুনলুম, চ'লে গেলো
গাড়ি। বাঁচা গেলো। আমাদের চিরকাল আরো একটি দিনে
এসে ঠেকলো। কিন্তু ছুটি আর সম্বল দুই-ই ফুরিয়ে এসেছে,
পরের দিন আর ঠেকানো যায় না। ঠাসো বাক্স, বাঁধো বিছানা,
গাড়ির আর দেরি নেই। ফিরতি পথে আবার খুরদা রোডে
বদলের হাঙ্গামা।

মাঝরাতে পুরীর হোটেলে ফিরে এলুম। ছোকরা চাকর
চিমা লণ্ঠন নিয়ে আমাদের সঙ্গে এলো তেতলার ঘরে।
ডাকবাক্সে আমাদের জন্যে অনেক চিঠি। বড় ভালো লাগলো।
চিমা তার আধো-আধো ওড়িয়া বাঙলায় বললে, 'কাল
আপনারা এলেন না, আমরা এত ভেবেথি।' এটাও লাগলো
ভালো। এ-ক'দিনেই পুরীর এই হোটেলের ঘর আমাদের
বাড়ি হ'য়ে গেছে। এখানে আমাদের জন্য চিঠি প'ড়ে থাকে।
এই ছোট ঘর তো আমাদের জিনিসেই ভরা। আপাতত,
এই আমাদের বাইরে থেকে ঘরে ফেরা।

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন ক'রে বলি।

কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে :

কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে ;
চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে,
মাঝখানে চিল্কা উঠছে ঝিলকিয়ে।

তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,
ইস্টিশানে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে।
গাড়ি চ'লে গেলো।—কী ভালো তোমাকে বাসি,
কেমন ক'রে বলি।

আকাশে সূর্য্যের বন্যা, তাকানো যায় না।
গোরুগুলো একমনে ঘাস ছিঁড়ছে, কী শান্ত!
—তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হ্রদের ধারে এসে আমরা পাবো
যা এতদিন পাইনি।

রূপোলি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতে ঝ'রে পড়ছে তার বুকের উপর
সূর্য্যের চুম্বনে।—এখানে জ্ব'লে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু
তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে
কখনো কি ভেবেছিলে?

আমি চঞ্চল হে

কাল চিল্কায় নৌকোয় যেতে-যেতে আমরা দেখেছিলাম
দুটো প্রজাপতি কত দূর থেকে উড়ে আসছে
জলের উপর দিয়ে।—কী দুঃসাহস! তুমি হেসেছিলে, আর আমার
কী ভালো লেগেছিলো

তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ মুখ। দ্যাখো, দ্যাখো,
কেমন নীল এই আকাশ—আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম
কেমন ক'রে বলি।

৯

খানসামা জিজ্ঞেস করলে: 'টিকিট না পাশ?' কথাটা বুঝতে না-পেরে মুখের দিকে তাকালুম। 'আপনারা কি পাশে যাচ্ছেন? তাহ'লে অন্যরকম বিল্ হবে।' না, পাশ নয়। এবং খুরদা রোড ষ্টেশনে গাড়িতে ব'সে এই আমরা দ্বিতীয়বার চা খাচ্ছি, এ ছাড়া পাশ মনে করবার আর-কোনো কারণও ভাবতে পারলুম না। চেহারা সম্বন্ধে লোকটার স্মরণশক্তি ভালো, বলতে হবে। প্রথমবার ভুবনেশ্বর থেকে পুরীর পথে। তারপর এই পুরী থেকে চিল্কা যাচ্ছি। বিকেলের চা এমনিতেই এত সুখকর যে তুলনা হয় না; দ্বিগুণ সুখকর, যদি তা খাওয়া হয় এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যাবার পথে রেল-গাড়িতে ব'সে। জীবনের এ একটি নিটোল-মধুর মুহূর্ত্ত; যখন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নিজের সম্পূর্ণ সমন্বয় অনুভব ক'রে মন শান্ত-সোনালি হ'য়ে ওঠে। ট্রেনে ব'সে এই চা-খাওয়ার জন্য যে দামটা দিই গৃহের তুলনায় সেটা অতিরিক্ত হ'লেও আসলে অতি তুচ্ছ। স্থান ও সময়ের সন্নিবেশে জিনিসের দাম স্বভাবতই বাড়ে কমে। সুইৎসল্যাণ্ডে পাহাড়ে চড়তে-চড়তে যে-ইংরেজ এক গ্লাস বিয়রের জন্য তার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিতে প্রস্তুত, নেমে এসে সরাইতে ব'সে সেই বিয়রের জন্য একটু বেশি দিতে হ'লে সে তীব্র প্রতিবাদ করবে। ট্রেনে শরীর ক্লান্ত থাকে, ক্ষুৎপিপাসা হয় পৌনঃপুনিক; সুতরাং বিকেল পড়তেই

যে-ষ্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়ালো, সেখানে যদি চমৎকার চায়ের ব্যবস্থা দেখা যায় তাহ'লে সেটা ঈশ্বরের আশীর্বাদই মনে হয়, মনে হয় না পয়সা দিয়ে কেনবার সামান্য পানীয়। রেলে-ইষ্টিমারে চা ও খাদ্য যে প্রায় সব সময়েই অতি উৎকৃষ্ট মনে হয় তার আসল কারণটা ওদের ভাঁড়ারে বোধ হয় নয়, আমাদেরই মনে।

আমরা চায়ে চুমুক দিচ্ছি অলসভাবে, আর মাঝে-মাঝে গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছি। ও-দুটো কাজ একসঙ্গে করতে পারা সত্যি রাজকীয় বিলাসিতা। অনেকগুলো কাজ *আছে যা এমনিতে বিশেষ-কিছু নয়; কিন্তু একাধিক যুক্ত* হ'লেই উপভোগ উপচিয়ে পড়ে। যেমন ধরা যাক্, বই পড়তে অনেক সময়েই ভালো লাগে, কিন্তু রাত্রে ঘুমের আগে বিছানায় শুয়ে বই পড়ার বিশেষ ও অদ্ভুত একটি আনন্দ আছে। সুখাদ্য অনেকেরই প্রিয়, কিন্তু সামাজিক নিমন্ত্রণে গিয়ে এক রাশ অপরিচিতের মাঝখানে ব স সে-রস বিষ হ'য়ে ওঠে রসনায়; আর নিজের বন্ধুদের সঙ্গে হাসিতে গল্পে মিশিয়ে যখন খাওয়া তখন তা ঔদরিক ভোজের সীমানা ছাড়িয়ে মনের উৎসব হ'য়ে ওঠে। এমনি অনেক ছোটখাটো যোগাযোগ থেকে আমাদের অনেক আনন্দের জোগান। সুখী হ'তে হ'লে সব সময় মস্ত ঘটনার দরকার করে না, জীবনের অতি সহজ অতি সাধারণ জিনিসগুলির সংযোগেই আমাদের প্রাণের লালন।

এখানে লাইনটা বাঁকা; আমাদের গাড়ি অর্দ্ধ-চন্দ্রের আকারে দাঁড়িয়েছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালে অন্য কামরাগুলো চোখে পড়ে, কোনো জানলায় একটা কনুইয়ের কোণ, কোনো জানলায় একটা মুখ বাড়ানো। ওদিকে গার্ডের

গাড়ি, এদিকে এঞ্জিনটা অস্পষ্ট। দু'দিকে প্ল্যাটফরমে নানা লোকের আসা-যাওয়া। এঞ্জিনগুলো এক লাইন থেকে আর এক লাইনে যাওয়ার সময় যেমন খানিকটা ফোঁসফোঁস ক'রে এদিক-ওদিক ঘোরে, তেমনি ঘুরছেন নীল ইজের আর কুর্ত্তা পরা রেলের সায়েবরা। একটা লোক খবরের কাগজ ফিরি করছে; কলকাতা ছেড়েছি পর ও-বস্তু ছুঁয়ে দেখিনি। হঠাৎ কৌতূহল হলো: দেখা যাক, এ-ক'দিনে পৃথিবী কোথায় পৌঁছলো। একখানা ষ্টেট্স্‌ম্যান কিনলুম। কোনো খবর নেই। এস্কিমোদের সম্বন্ধে একটা চলনসই 'গল্প' আছে, সেটা পড়া গেলো। কোনোদিনই যেন কাগজে কোনো খবর থাকে না। কোনোদিনই আমি পড়বার মত কিছু খুঁজে পাইনে এতে। তবু বাড়িতে সকালবেলায় যতক্ষণ না খবরের কাগজ খুলেছি, মনে শান্তি নেই। ভাঁজ-করা টাটকা পাতাগুলো হাত দিয়ে খুলতেই যেন ভারি একটা সুখ। পেয়ালায় চা ঢাললেই যে-গন্ধটি বেরোয় তা যেন বন্ধুর গলার চির-পরিচিত ডাকের মত; কাগজের গায়ের গন্ধেও তেমনি একটি অভ্যস্ত সম্ভাষণ। সেই স্পর্শ আর গন্ধের জন্যই খবরের কাগজ অপরিহার্য্য হয়েছে আমার জীবনে। প্রথম সেই মুহূর্ত্তটিই ভালো, তারপর খুলে আর ভিতরে কিছু পাই না। দু' কলম জোড়া হেড-লাইন ফ্যালফ্যাল ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনামা দেখেই ভড়কে যাই: একমাত্র পঠিতব্য মনে হয় বিজ্ঞাপনগুলোই। অনেক চেষ্টা ক'রেও দশ মিনিটের বেশি ও নিয়ে নাড়াচাড়া চলে না। তারপর ইস্ত্রি-করা ফিটফাট মহোদয়ের ছেঁড়াখোঁড়া হ'য়ে মেঝেয় গড়াগড়ি। আমার খেলার বাতিক নেই, ক্রস্‌ওয়ার্ডের মাথা নেই; শেয়ার-মার্কেটের

খবরের দরকার নেই—এবং সর্বোপরি পলিটিক্স সম্বন্ধে ছিটে-ফোঁটা আগ্রহও নেই। কথাটা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করছি: কিন্তু আমার মত নিষ্কর্মা অসামাজিক জীবেরও যাতে আত্মসম্মান বজায় থাকে, সেইজন্যেই বোধ হয় আনাতোল ফ্রাঁস তাঁর এক চরিত্রকে দিয়ে বলিয়েছিলেন: 'আমি তো এমন প্রতিভাহীন নই, ম্যাডাম, যে পলিটিক্সে আমার কোনো-রকম আগ্রহ থাকবে।'

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান প'ড়ে রইলো, গাড়ি এখনো ছাড়ছে না। ষ্টেশনটি সুন্দর। সুন্দর আমাদের গাড়ির এই দাঁড়াবার অর্দ্ধ-বৃত্ত ভঙ্গি। এখানে অপেক্ষা করতে বিরক্ত লাগে না। তাকিয়ে ছাখো। একটু পরেই এঞ্জিনে টান পড়বে, ঋজু হবে ট্রেনের লম্বা শরীর, পাশের জানলায় পাগড়ি-বাঁধা মাথা আর দেখবো না, আমরা ছুটবো মাঠ ছাড়িয়ে নদী পেরিয়ে পাহাড় পিছনে ফেলে। নতুন জায়গায় চলেছি ব'লে মনে-মনে আমরা উত্তেজিত, তবু আমাদের পৌঁছবার তাড়া নেই। গন্তব্যের চাইতে পথের আকর্ষণ কম নয়; যেমন কিনা উপায়ের সার্থকতা অনেক সময় নিজের মধ্যেই, লক্ষ্যের মহিমায় নয়। রুদ্ধচোখে ঊর্দ্ধশ্বাসে কোনোরকম ক'রে অভীষ্টে পৌঁছতে পারলেই হ'লো, এ হচ্ছে বেনে মনের কথা—যেমন একটা কথা আছে যে পয়সা হ'লেই হ'লো, উপায়টা যা-ই হোক্; যেমন সওদাগরি দালালের ভ্রমণ সব-চেয়ে-অল্প সময়ে সব-চেয়ে-বেশি মুনফার হিসেবে ছক-কাটা। আর্টের প্রধান মহিমা তো এইখানেই যে সেখানে কোনো তাড়া নেই। একমাত্র আর্টই হাতে-হাতে নগদ দাম পাওয়ার বৈশ্য প্রত্যাশা থেকে মুক্ত। জিনিসটার রচনাতেই আনন্দ; ফললাভ—অন্তত তখনকার

মত—অবান্তর। রাস্তাটাই এত সুখের যে গন্তব্যের কথা আর মনে থাকে না। লেখায় একটা ছোট্ট কাটাকুটির উপর কলম বুলোতেও ভালো লাগে; ছবিতে নতুন রঙের একটা পোঁচ দিয়ে দশ মিনিট তাকিয়ে থাকা যায়। 'নষ্ট' হয় না সে-সময়টা। কিন্তু যে-লোক দশটার সময় আপিসে চলেছে সে যদি হঠাৎ সকালবেলার ময়দানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে ট্রাম থেকে নেমে মাঠে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ায় তাহ'লে পরদিন থেকে হয়-তো সে আপিসে যাওয়ার দায় থেকেই নিষ্কৃতি পাবে; যে-লোকের দু'শো কাগজ সই ক'রে আজকের ডাকেই পাঠাতে হবে, সে নিজের সুশ্রী হস্তাক্ষরের দিকে তাকাতে গিয়ে আধ মিনিটও দেরি করতে পারে না। জীবনে সকল ক্ষেত্রেই আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা ও অন্যমনস্কতা দোষাবহ; এক আর্টের ক্ষেত্রেই ওগুলো সার্থক।

আমাদের বেড়ানোও আমার এই লেখারই মত; তার পৌঁছবার গরজ নেই, পথে-পথে কেবলই নানা ছুতোয় সে দেরি করছে। এখানে একটু দাঁড়াও, ওখানে একটু ছাখো। কিসের গন্ধ লাগলো; এলো স্মৃতির হাওয়া। ভাবনার কত রঙিন সুতো ঢিলে হ'য়ে ঝুলে পড়ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে পরস্পরে; সেগুলোকে মেলানো যদি না যায় তো না-ই গেলো। প্রতিটি আলাদা সুতো উজ্জ্বল হ'য়ে আসে চোখের সামনে, তাকিয়ে দেখতে হয়। তাকাতে হয় ঐ ওদিকের লাইনে সার-বাঁধা মালগাড়ির দিকে। এত লম্বা, শেষটা ধূ-ধূ করছে। এরা আলাদা চেহারার, এমনকি আলাদা রঙের—কেননা এক-এক কোম্পানির এক-এক গাড়ি। বি-এন্, ই-আই, এম্-এস্-এম্, জি-আই-পি—ভারতবর্ষের এমন রেল-কোম্পানি প্রায় নেই, ওখানে যার

ভাগ না আছে। গাড়িগুলোর চেহারার সূক্ষ্ম তারতম্য লক্ষ্য করি, কে কত টন্‌ নিতে পারে সে-অঙ্কগুলো পড়ি মন দিয়ে, ক' মণে এক টন হয় সে-হিসেবও মনে-মনে প্রায় হ'য়ে যায়। পৃথিবীর পরম একটি রহস্য মনে হয় একে—এই নিশ্চল, নিশ্চিন্ত, ষ্টেশনের এক প্রান্তে প'ড়ে-থাকা মালগাড়িগুলো। আমার বুদ্ধি, আমার হিসেবের ক্ষমতা এ-রহস্যের তল খুঁজে পাবে না কখনো। কেন আছে ওরা ওখানে? কী আছে ওদের ভিতরে? ওরা কি সবাই একই জায়গায় যাবে, নাকি এক-এক তারিখে এক-এক এঞ্জিনের পিছনে এদের যাত্রা? উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা কোম্পানির নানা গাড়ি যে এই ষ্টেশনে এসে জুটেছে, এর পিছনে হয়-তো আছে কত বছরের কত দিগ্বিদিক যাওয়া-আসা। ভাবতে রোমাঞ্চ হয়। প্রায় সব ষ্টেশনেই সব সময় দেখা যায়, এমনি কিছু-কিছু মালগাড়ি-সংগ্রহ প'ড়ে রয়েছে। এদের উপরে রেল-কোম্পানির যেন কোনো মায়াই নেই, নিতান্ত অনাদরে অবহেলায় সমস্ত দেশ ভ'রে এরা যেখানে-সেখানে ছিটোনো। একটা ষ্টেশন ছাড়িয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ দেখলুম, অনেক আঁকাবাঁকা লাইনের মাঝখানে এক কোণে দুটো নিঃসঙ্গ মালগাড়ি নিতান্ত অকারণে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে-সঙ্গে এক বিশাল বিস্ময়ে মন ভ'রে যায়; রেলের বিরাট ব্যবস্থার কোন্‌ ক্ষুদ্র ও অপরিহার্য্য অংশ যে এই গাড়ি দুটো এখানে দাঁড়িয়ে পূর্ণ করছে তা ভাবতে গিয়ে কল্পনাতেও ঝিম ধরে। দেখে মনে হয় না, এদের দিয়ে পৃথিবীতে কারো কিছু দরকার আছে। এদের পাশ দিয়ে দিনে আর রাত্রিতে কত গাড়ির রুদ্ধশ্বাস যাওয়া-আসা; এরা অচঞ্চল, এরা অকারণ। মালিক-কোম্পানি এদের আর কখনো ফিরে পাবে কিনা তা-ই

বা কে জানে। ভাব দেখে মনে হয়, মালগাড়ি কিছু-কিছু খোয়া গেলেও কোম্পানির বিশেষ এসে যায় না। কিন্তু তা তো হ'তে পারে না; নিশ্চয়ই আসে একটা সময় যখন প্রতি কোম্পানিরই মালগাড়ির হিসেব মিলোতে হয়। সে-সময় কখন্—গাড়িগুলো তো সব সময়ই সমস্ত দেশ ভ'রে ছড়িয়ে আছে। আর হিসেবখানাও তো সোজা নয়—তা কি মানুষ মিলোতে পারে! এমন কি কখনোই হয় না যে অন্তত দু'চার-খানা গাড়ির খোঁজ মিলছে না—ধরা যাক্, সেই দুটো গাড়ি যা আমরা ষ্টেশন ছাড়িয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ দেখেছিলুম? কর্ত্তারা তো ভুলেও যেতে পারেন।

অবশ্যি কোনো গোলমালই কখনো হয় না। গাড়িগুলো নিখুঁত হিসেব-মতই চলে, দাঁড়ায়, সার বাঁধে; আর এ-সব হিসেব মিলোবার কোনো সূক্ষ্ম সংক্ষিপ্ত কৌশলও আছে নিশ্চয়ই, আর মোটা মাইনের অনেক চাকুরেও আছে এর জন্যে—মোট কথা সবই ঠিকমত হচ্ছে, মাঝখান থেকে আমিই খামকা ভেবে মরছি। ভাবনার কোনো কারণই নেই; প্রতিদিনের জীবনে এমনি কত আশ্চর্য্য জিনিসই তো আমরা আজকাল অনায়াসে মেনে নিচ্ছি, নেপথ্যে আছে অসংখ্য লোক যারা অবিশ্রান্ত মাথা ঘামাচ্ছে আর খাটছে। আমাদের জলের কল আর ইলেকট্রিসিটি আর ঘুম ভাঙার আগে রোজ সকালে মুড়মুড়ে খবরের কাগজ—এ নিয়ে কখনো কি আমরা ভাবি? সুবিধে-গুলো নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে ভোগ ক'রে যাওয়ার জন্যে আমরা। কখনো-কখনো ভাবতে ভালো লাগে, এই যা; অবাক হ'তে ভালো লাগে; ভালো লাগে ষ্টেশনের এই ব্যস্তসমস্ত হাঁশফাঁশ ভাবের মধ্যে এক ধারে নির্বোধের মত চুপ ক'রে

দাঁড়িয়ে-থাকা এই মালগাড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হ'তে। ই-আই, জি-আই-পি, এস্-আই ; প্রতিটি কথা যেন জাদুকরের মন্ত্র, অত ছোট্ট শব্দের মধ্যে চাপা রয়েছে, অফুরন্ত ইঙ্গিত। মনে-মনে এক-একটি কথা উচ্চারণ করি, আর মনের এক-এক দিগন্ত খুলে যায়। শ্রীনগর থেকে ধনুষ্কোডি পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ যেন মগজের মধ্যে বোঁ ক'রে ঘুরে উঠে। এরা নিজেরা নিশ্চল, এই গাড়িগুলো, কিন্তু এরা মনে আনে কত দূরের কত দিগন্তের ছবি, কত কল্লোলিত সমুদ্রের, কত অলস সূর্য্যের, কত নগরের, কত নীরবতার, আর কত অরণ্য-নীল রাত্রির।

কিন্তু ঘণ্টা বেজেছে, গাড়ি ছাড়লো। যেদিক থেকে এসে-ছিলাম, মনে হয় সেইদিকেই আবার চলেছি। ষ্টেশন ছাড়িয়ে আসতে-আসতে কত লাইন কিলবিলে সাপের মত গাড়ির চাকার নিচে ঢুকলো আর মিলিয়ে গেলো। এখন আমাদের উল্টো-দিকে আর-একটা লাইন শুধু রইলো, এটা পুরী গেছে, এটা দিয়েই আমরা এসেছিলাম। এখন চলেছি মান্দ্রাজের লাইনে। ভুবনেশ্বর থেকে পুরী আসতে-আসতে খুরদা রোডের পরে এই মান্দ্রাজের লাইন যখন আলাদা হ'য়ে বেরিয়ে গেলো, মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে ছিলুম তার দিকে। চলতি গাড়ি থেকে অন্যদিকের অন্য কোনো লাইন দেখতে বড় অদ্ভুত লাগে। নিজেকে হঠাৎ ব্যর্থ মনে হয় ; মনে হয় ঐ লাইন গেছে না জানি কত আশ্চর্য্য দেশে, কত রহস্যের প্রান্তে—ঐ রাস্তায় যারা বেরিয়েছে তারাই ধন্য। নিঃসীম নির্জনতার মধ্যে এই ধূ-ধূ রেললাইন দেখলেই মুহূর্ত্তে যেমন সুদূরের তৃষ্ণায় রক্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, তেমন কি অন্য কিছুতে হয়? মান্দ্রাজের এই লাইনকে তখন মনে হয়ে-

ছিলো রূপকথার দেশে যাবার নির্ভুল রাস্তা ; এখন চলেছি সে-রাস্তাতেই, পুরীর লাইন এইমাত্র দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে গেলো, এখন দু'দিকের ঢেউ-খেলানো সবুজে বিকেলের বন্যা।

১০

কালপুরুষকে কতদিন দেখেছি। কত আশ্বিনের সবুজ সন্ধ্যায় পূর্ব দিগন্তে প্রশ্ন-চিহ্নের মত, কত চৈত্র সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে তির্য্যক ছাঁদে ঝুলন্ত, কত মৃত জোছনায় ম্লান, কত অন্ধকারে আশ্চর্য্য উজ্জ্বল। কত জানলা থেকে দেখেছি তাকে, দেখেছি গলির উপরে, সহরের পথে যেতে-যেতে সেই ভীষণ জলন্ত মূর্ত্তি চমক লাগিয়ে দিয়েছে কতবার। আমাদের আকাশে এই জ্যোতির্ময় আতঙ্কের মত আর-কিছু নেই,—কোটি কল্পের এই ধ্বংসহীন সূর্য্যপুঞ্জ, অন্ধকারের দুরন্ত হৃৎপিণ্ড যেন। আর আছে শান্ত গম্ভীর সপ্তর্ষি, উত্তরের আকাশে নিঃস্পন্দ। কাল-পুরুষ আনে আমাদের রক্তে দুর্দান্ত হিংস্রতা, সপ্তর্ষি আনে শান্তি। কতদিন আমি খুঁজেছি সপ্তর্ষিকে এই শেষ শরতের আকাশে, দেখা পাইনি। আজকাল বড় দেরি ক'রে ওঠে সে, তখন আমাদের ঘুম। আজকাল সূর্য্যাস্ত থেকে সূর্য্যোদয় সমস্ত আকাশ কালপুরুষেরই খড়্গে দ্বিখণ্ডিত। আছে আরো অনেক তারা, তারা ম্লান, তারা বিচ্ছিন্ন ; তাদের কোনো নির্দ্দিষ্ট সম্মিলিত মূর্ত্তি আমার চোখে ধরা পড়ে না। এ-আকাশে আরো কত নক্ষত্রপুঞ্জের মেলা, কিন্তু আমার আনাড়ি চোখ তাদের চেনে না : কালপুরুষের অসহ্য সৌন্দর্য্যে ক্লান্ত, আমি খুঁজি সপ্তর্ষির শান্তি। কোন্ গভীর রাত্রে উঠে আসে সে, চুপে-চুপে, ভীরু ভাঙা চাঁদের মত; একটু পরেই বুঝি মিলিয়ে যায় ভোরের

আভাসে। যাবে শীত, প্রথম বসন্তে যখন দক্ষিণে হাওয়ার দোলা, তখন এক সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখবো দিগন্তের উপরে ভীরু সপ্তর্ষি, আর কালপুরুষ পশ্চিমে আনত।

—কিন্তু এ-দেখাও আমার অদৃষ্টে ছিলো! হঠাৎ ভাঙলো ঘুম, তারপর ঘুমের জড়তা কাটিয়ে এটা উপলব্ধি করতে কিছু সময় লাগলো যে আমাদের গোরুর গাড়ি আছে দাঁড়িয়ে। কানে এলো গাড়োয়ানের শীতে-কর্কশ কণ্ঠস্বর : চীৎকার ক'রে আমাদের ডাকছে। সেই অতি সঙ্কীর্ণ শকটের লেপ-চাপা অবলুপ্তি থেকে উঠে আসাও বড় সহজ কথা নয়। উঠতে হ'লো : অন্ধকারে ঘড়ির জ্বল্‌জ্বলে কাঁটায় ঠিক তিনটে বেজেছে। বেরিয়ে এলুম গোরুর গাড়ির ঘুটঘুট্টি অন্ধকার থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে স্বপ্নের মত কানে বাজলো জলের ছলছলানি।

গাড়োয়ান বললে : নদীতে জোয়ার এসেছে। নদী? ঐ তো নিয়াকিয়া নদী। তারার আলোয় দেখা গেলো ম্লান জলের অস্পষ্ট ঝিলিমিলি। পার হওয়া যাবে না? গাড়োয়ান মাথা নাড়লো। নৌকো? নৌকোয় গাড়ি-সুদ্ধ পার হওয়া যায় বটে, কিন্তু নৌকো কোথায়? গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালুম, দীর্ঘরাতের শিশিরে বালুগুলো ভেজা, জুতোর উপর দিয়েও টের পাওয়া যায়। সেই বিশাল, শূন্য বালু-প্রান্তরে গাড়োয়ান হাতের আঙুল গোল ক'রে মুখে ঠেকিয়ে শীতে ভাঙা-ভাঙা গলায় চীৎকার ক'রে মাঝিকে ডাকতে লাগলো। বার-বার ফিরে এলো প্রতিধ্বনি নদীর ওপার থেকে। আজ এই হাজার তারা-ভরা আকাশের তলায়, এই নিঃসীম নিঃস্পন্দ অন্ধকারে আমরা ছাড়া আর-কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। শুধু মাঝে-মাঝে সমুদ্র ডেকে উঠছে বাঘের মত। সমুদ্র কোথায়?

জানি না। শুধু সারা-রাত সমুদ্রের ডাক এসেছে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে, হঠাৎ বুঝি ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ধাক্কা লাগলো, যেন ধ্ব'সে পড়লো বিরাট মাটি গাছপালা পোকা-পাখি আর পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর নিয়ে, যেন হঠাৎ গুলি-খাওয়া বাঘের হুঙ্কারে অরণ্য তোলপাড় ক'রে উঠলো। পূর্ব-বঙ্গে নদীর ভাঙন যারা জানে, তাদের কাছে রাত্রি-ভরা এই গুমগুমানি একেবারে অপরিচিত নয়। আমাদের পথে-পথে কখন থেকে এই শব্দ, ঘুমের মধ্যে চমক-লাগানো, কখনো দূরের রেলগাড়ির শব্দের মত ঘুম-পাড়ানো। তারপর রাত্রির শেষে ঘুম-ভাঙা কানে এই তোলপাড় চুরমার, হাজার তারার আকাশের নিচে, নিয়াকিয়া নদীর ধারে।

এ-কথা বলতে হবে এমন আকাশের নিচে আর কখনো আমি দাঁড়াইনি, এমন নীরন্ধ্র নিঃস্পন্দ রাত্রিময় প্রান্তরের মধ্যে। সমস্ত দিকে ছড়িয়ে স্তব্ধ, অস্পষ্ট বালু-বিস্তার : আর-কিছু চোখে পড়ে না, দূরে যদি থাকে গাছের সারি মনে হয় রাত্রিই নেমেছে নিবিড় হ'য়ে দিগন্তে। উপরে তাকালুম : আর আকাশে যা চোখে পড়লো তা ঠিক ঐরকম ক'রে আমি আর দেখবার আশা রাখি না। প্রথম কথা, আকাশ বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি, এ সে জিনিসই নয়। আকাশের ভাঙা-ভাঙা রঙিন টুকরো নিয়ে আমরা সাজাই মনের খেলাঘর, সমস্তটা আকাশ একসঙ্গে কল্পনাতেও আসে না আমাদের। এ কি কখনো আমরা ভাবতে পারি, এই যে আকাশ উঠে গেছে সমস্ত দিক থেকে তীক্ষ্ণ তারা-স্রোতে, বাধা নেই, দ্বিধা নেই, সমস্ত পৃথিবীর উপরে চিরকালের ছায়ার মত ছড়ানো। ক্ষুদ্র সীমায় অভ্যস্ত আমাদের চোখ এতটা একসঙ্গে নিতে পারে না,

পড়ে ক্লান্ত হ'য়ে। টুকরো চাঁদ অস্ত গেছে প্রথম প্রহরেই; এখন আকাশের প্রান্ত থেকে প্রান্ত জ্বলন্ত জীবন্ত তারায়-তারায় নিঃশ্বসিত। ঠিক মাথার উপরে দেখলুম কালপুরুষ, আর উত্তরের দিগন্তে এইমাত্র বুঝি সপ্তর্ষি উঠে এলো। স্পষ্ট দেখলুম সাতটা তারা, আর তাদের শান্ত ভঙ্গি, আর মাথার উপরে তীব্র হিংস্র কালপুরুষ আকাশের মাঝখান দিয়ে যেন ফাটল ধরিয়ে দেবে। এত তারার চাপে আকাশ বুঝি ভেঙে পড়লো। কিন্তু ভিড় থেকে বিচ্ছিন্ন, নির্লিপ্ত, আকাশের দূর প্রান্তে ঐ তো সপ্তর্ষির শান্তি—সপ্তর্ষিকে কতদিন পর দেখলুম !

গাড়োয়ানের হাঁক-ডাকের কোনো জবাবই এলো না, নিয়াকিয়া ছলছলিয়ে ব'য়ে চলেছে। ছোট্ট নদী, কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে এর যোগ, এখন তাতে এসেছে জোয়ারের ধার। এখন পার হওয়া যাবে না ; ভোরবেলায় লাগবে ভাটার টান, ততক্ষণ এখানেই অপেক্ষা। বিকেলবেলা পুরীর হোটেল থেকে বেরিয়েছিলুম, মনে আশা ছিলো প্রতিষ্ঠিত প্রথা-অনুযায়ী সূর্য্যোদয়ের আগেই কোনারক পৌঁছনো যাবে। গেলো সে-আশা। আমাদের এই গাড়োয়ান হোটেল থেকে রওনা হ'য়ে সহরের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত রাস্তায় যাকে-তাকে ডেকে বলেছে, 'কোনারক যাউটি।' *বুঝলুম, গো-যানচালকদের মধ্যে* কোনারক-যাত্রা কৌলীন্যের চিহ্ন। *এত ঘটা ক'রে যখন আরম্ভ* করলো, তখন এই পরিচালক ঠিক-মত আমাদের পৌঁছিয়ে দেবেই, এমন আশা ছিলো মনে। তা হ'লো না ; কাছাকাছি এসে এখন তিন ঘণ্টা অপেক্ষা। কোনারকের 'বিখ্যাত' সূর্য্যোদয় দেখা আমাদের কপালে নেই।

সুতরাং গুঁড়িসুড়ি মেরে ফিরে গেলুম বিছানাতেই। এটুকু তো গাড়ি, তার মধ্যে আমরা, আমাদের জলের কুঁজো, আমাদের শীতবস্ত্র, একটি বাক্সে চায়ের পেয়ালা ষ্টোভ ইত্যাদি—কিছুই ভুলিনি। টর্চের আলোয় জায়গা দেখে নিয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে শুয়ে পড়লুম। কোনো বন্য জন্তুর সবুজ স্ফুরিত চোখের মত ইলেকট্রিক টর্চ মুহূর্ত্তের জন্য জ্ব'লেই নিবে গেলো। গাড়ির মধ্যে জমাট অন্ধকার। মনে হয় আদিম কোনো গুহার মধ্যে শুয়ে আছি। বাইরের বাতাসে থমকে-থমকে সমুদ্রের স্বর আছড়াচ্ছে শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

ঘুম যখন ভাঙলো, তখন বেশ বেলা। রোদ্দুর উঠেছে ঝিলকিয়ে। পথ দিয়ে চলেছে দু'চারজন দেহাতি লোক। নদীতে এখন ভাটা, গাড়িসুদ্ধ পার হ'য়ে গেলুম। নদীর মাঝ-খানে গোরুর গলা অবধি জল। গোরু দুটো কাঁপতে-কাঁপতে এসে পৌঁছলো উল্টো পাড়ে। সেখানে কয়েক ঘর বসতি, হাট গোছের বোধ হয়, তারপর ধূ-ধূ মাঠ আর মাঠ গড়িয়ে চলেছে। এখন চা খেতেই হবে। বেরুলো ষ্টোভ আর পেয়ালা আর রসদ, কিন্তু সেই দিকশূন্য প্রান্তরে হু-হু হাওয়ায় ষ্টোভ কিছুতেই ধরে না। গাড়ি থামিয়ে গাড়ির তলায় ঢুকে চেষ্টা করা গেলো, হ'লো না। অগত্যা গাড়ির ভিতরেই দু'দিকে কাপড় খাটিয়ে আড়াল ক'রে নেয়া হ'লো; ধরলো ষ্টোভ, হ'লো চা খাওয়া।

ধূ-ধূ করছে ব্রাউন রঙের প্রান্তর। ঘাস নেই, গাছ অল্প। চারদিকে তাকিয়ে একটা কুঁড়ে ঘরও চোখে পড়ে না। কদাচ দু' একটি লোকের আসা-যাওয়া। এত ফাঁকা জায়গাও আজ-কালকার পৃথিবীতে আছে! কিন্তু উড়িষ্যার এই অভ্যন্তর বুঝি আজকালের নয়। এখানে যেন পুরোনো পৃথিবীর প্রসার ও

শূন্যতা। বইছে বালু-ওড়ানো হাওয়া মাইলের পর মাইল। ফসল ফলে না: অকারণ অর্থহীন ঈষৎ বন্ধুর মাটি গড়িয়ে চলেছে, নেহাৎই যেন আমাদের আর কোনারকের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান বাড়াবে ব'লে। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে টল্‌স্টয়ের সেই ভীষণ গল্প মনে পড়ে: মানুষের কতটা জায়গা লাগে। এখানে যদি কেউ সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পরিক্রমণ করে, সে একটি রাজধানী বসাবার মত জায়গা দখল করতে পারবে—এবং তার জন্যে বোধ হয় তাকে বিশেষ-কিছু দিতেও হবে না। কিন্তু বিনাযুদ্ধে বিনামূল্যে পেলেও এ-ভূখণ্ড কেউ কি কখনো নিতে চাইবে—উড়িষ্যায় এমনিতেই জায়গার ছড়াছড়ি। মনে হয় এ-সমস্ত জায়গা এমনি খাঁ-খাঁ করবে চিরকাল, রেল-লাইন থেকে দূরে, সভ্যতা থেকে দূরে, সময় থেকে দূরে। পৃথিবীতে যুদ্ধ বাধবে, ডুববে এক দেশ, অন্য দেশ জাগবে; মানুষ সম্পূর্ণ করবে তার বৈবর্ত্তনিক নিয়তি; কিন্তু এই শূন্য ব্রাউন প্রান্তর এমনিই প'ড়ে থাকবে চিরকাল, আর তার উপর দিয়ে মাঝে-মাঝে আমাদেরই মত কোনো যাত্রী গোরুর গাড়িতে যাবে কোনারকের দিকে।

এখন আর সমুদ্রের শব্দ শুনছি না, সকালের আলোয় অদ্ভুত স্তব্ধ পৃথিবী। রাত ভ'রে সমুদ্রের গর্জন এলো আমাদের সঙ্গে, হঠাৎ কি সমুদ্রকে অনেক দূরে ফেলে এলাম, নাকি অন্য-কোনো কারণে শব্দটা এসে পৌঁচচ্ছে না? কোনারকের মন্দিরে উঠতে-উঠতে সমুদ্র যদি চোখে না-পড়তো তাহ'লে প্রথম কারণটাই নিঃসংশয়ে ধ'রে নিতুম। অনেকটা দূর অবিশ্যি, কিন্তু রাত্রেই কি খুব কাছে ছিলো? এ-সমস্যার মীমাংসা হবে না। আর মীমাংসা হবে না পুরীর সমুদ্রের অদ্ভুত ব্যবহারের।

পুরীতে বীচ ছাড়িয়ে সহরের দিকে একটুখানি ঢুকলেই সমুদ্রের সেই প্রচণ্ড চীৎকার একেবারে মিলিয়ে যায়। অথচ কোনারকের পথে কতদূর থেকে শোনা গেলো সমুদ্রের গর্জন। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত, অন্বেষণের যোগ্য। দুঃখের বিষয়, এই রহস্যে প্রবেশ করবার মত সঙ্গতি আমার আদৌ নেই। অথচ জগন্নাথদেব সমুদ্রের গোলমাল পছন্দ করেন না, এ-কথা শুনে জগন্নাথের মহিমায় বিহ্বল হ'য়ে চুপ ক'রে থাকার ক্ষমতাও অবিশ্যি নেই আমার। আমি শুধু অবাক হ'তে পারি, শুধু পারি মনে-মনে ছটফট করতে।

কলকাতায় ফেরবার গাড়িতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা; তিনি পুরীরই বাসিন্দা, এবং উড়িষ্যার পুরাবৃত্তে পণ্ডিত ব'লে খ্যাত। অনেক আশা নিয়েই প্রশ্নটা তাঁর কাছে উত্থাপন করেছিলুম। কিন্তু তিনি প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি ক'রে তারপর এমনভাবে চুপ ক'রে গেলেন যেন সেটা আলোচনার যোগ্যই নয়। মনটা দ'মে গেলো, তবু পণ্ডিতের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের লোভ সামলাতে না পেরে কোনারক ও পুরীর মন্দিরের গায়ে মিথুন-মূর্ত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করলুম। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মুখ চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো; তিনি আমাকে সাগ্রহে জানালেন যে এ-দেশের 'আর্চিটেকচার' নিয়ে তিনি অনেক গবেষণা করেছেন, সম্প্রতি তাঁর একটি প্রবন্ধও লেখা হয়েছে, এবং প্রবন্ধটি তাঁর সঙ্গেই রয়েছে বাক্সে। 'তাহ'লে লেখাটাই আপনাকে প'ড়ে শোনাই।' ভদ্রলোক বাক্স থেকে প্রবন্ধটি বার করবার আয়োজন প্রায় করেন আরকি, এমন সময় জগন্নাথ-দেবের দয়া হ'লো, গাড়ি দিলো ছেড়ে, আর আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলুম। আমি নিতান্তই অজ্ঞ ব'লে অতি

সরল একটা প্রশ্নই করেছিলুম, ভদ্রলোক তার উত্তরে আমার মাথায় 'আর্চিটেকচারে'র ইঁট ছুঁড়ে না-মারলেই দয়া করতেন।

বেলা দশটায় কোনারক পৌঁছলুম। হঠাৎ একটা গাছে ভরা উঁচু জায়গায় ঢুকলো আমাদের গাড়ি। শুনলুম, এসে গেছি। দূর থেকেই মন্দিরের দর্শন মিলবে, এইরকম একটা ধারণা ছিলো, কিন্তু সারি-সারি লম্বা ঝাউগাছের আন্দোলিত ছায়ার উপর দিয়ে গাড়ি চলেইছে। ডাকবাংলোই বা কোথায়? মস্ত এক ঝাউবনে ঢুকেছি আমরা, অবিশ্রান্ত উঠছে শোঁ-শোঁ দীর্ঘশ্বাস। ঐ একটা পুকুর। এখানেই গাড়ি থামবে। গোরুর গাড়িতে ষোলো ঘণ্টা : একটা ছোটো গল্পের চমৎকার নাম। ঐ পুকুরের ধার দিয়ে হেঁটে যেতে হবে, অ্যাটাশে কেসটা হাতে নিয়ে নাও।

পুকুরের ধার দিয়ে এসে বাঁক পার হ'য়ে উঠতেই রোদে ঝলসে উঠলো পুরোনো ছবির মত একটি হলদে রঙের একতলা বাড়ি। একমুহূর্ত্ত আগেও তাকে দেখিনি। সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম বারান্দায়, ঘর খোলা হ'লো আমাদের জন্যে, খোলা হ'লো স্নানের ঘর, টবে এক্ষুনি জল ভরা হবে। এখানে আছে সভ্যতার নানা আয়োজন। আগে দাঁত মাজতে হবে। এখনো মন্দির দেখিনি : আগে বিশ্রাম হোক্, স্নানাহার হোক্।

বিশাল মর্মরিত ঝাউ-বনের মধ্যে এই মন্দির আর ডাক-বাংলো পাখির মত লুকিয়ে আছে যেন। একেবারে কাছে না-এলে কিছুই বোঝা যায় না। ডাকবাংলোটি একটু ফাঁকা জায়গায়, তাতে ঢোকবার প্রধান পথটির দুদিকে ঝাউয়ের সারি; অন্যদিকে প্রকাণ্ড সবুজ প্রাঙ্গণের মাঝখানে ইঁদারা। ঝাউবনের বুকের ভিতর থেকে যে একটি সূক্ষ্ম নিঃশ্বাসের ঢেউ

কেবলই উঠছে-পড়ছে, তা যেন কোনো চিরন্তন স্তব্ধতারই সুর। কাছাকাছি একটা রেল-লাইনও নেই যে এই স্তব্ধতা মুহূর্ত্তের জন্যও ভাঙবে। মোটরের রাস্তা আছে, তা বছরে ছ' মাস বন্ধ; ঝাউয়ে লুকোনো, হাওয়ায়-ধোয়ানো, আলোয়-ঝলসানো এই স্বর্গে পৌঁছতে গো-যানই গাত।

এখানে ক্লান্তি নেই। আসতে-আসতে শেষের দিকে অবসন্ন লাগছিলো, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে এই বাড়িতে ঢুকেছি, যে-মুহূর্ত্তে গায়ে লেগেছে এই ঝাউয়ের হাওয়া, ফুর্ত্তির ঢেউ হ'য়ে উঠেছে আমাদের শরীর। আকাশে উড়তে-উড়তে হঠাৎ পাখি দিক বদল করে, সেই তীক্ষ্ণ বাঁকা রেখা যেন আমি। এ কোথায় এলাম? এত আলো, এত আকাশ, এত শান্তি, আর এমন স্বচ্ছ উজ্জ্বল নীরবতা—বিশ্বাস হয় না যেন। এখানে যেন সৃষ্টির কাজ এখনো শেষ হয়নি; মাত্র ষোলো ঘণ্টা গোরুর গাড়ি চ'ড়ে আমরা পালিয়ে এসেছি সময় থেকে, আমরা মুক্তি পেয়েছি কোন্ স্তব্ধ নিভৃত অতীতে, কোন্ আদিম সময়হীনতায়।

নাকি এই নগ্ন সরল স্তব্ধতায় আমরাই নিয়ে এলাম তালি-দেয়া কাটাছেঁড়া বর্ত্তমানকে? আমাদের আত্ম-বিস্মৃতি কখনোই বুঝি সম্পূর্ণ হয় না। যতই ডুবে যাই, কোথায় যেন ভেসে ওঠে শক্ত, একগুঁয়ে একটা সচেতনতা। এখানে আমরা নিয়ে এসেছি আমাদের বছর আর তারিখ: ভুলিনি। খাবার আগে যেটুকু সময় তাতে আমরা বাড়ির লোকদের চিঠি লিখবো। কাগজ-কলম ডাকটিকিট আছে সঙ্গে। কিন্তু খবর পেলাম, নিকটতম ডাকঘর পাঁচ মাইল দূরে, রাজার ডাক ধরতে হ'লে মাঝামাঝি আর-কোনো উপায় নেই। নিশ্চিত ছিলুম যে ডাকবাংলোয় ডাকবাক্স একটা আছে নিশ্চয়ই, এবং যদিও

কলকাতার বাইরে এলে ডাকবাক্স সম্বন্ধে আমার মনে দ্বিধার অন্ত থাকে না, তবু তারই ভরসায় কলম শানিয়ে নিচ্ছিলুম। ছেলেবেলায় ছিলুম মফঃস্বলের পাড়াগেঁয়ে সহরে, রাস্তার লাল বাক্সের প্রতি অবিশ্বাসের সূত্রপাত সেখানেই। হঠাৎ লোকালয়ের বাইরে শূন্য রাস্তায় এক টগর গাছের ডালে সাত জায়গায় তুমড়ানো রঙ-চটা একটা বাক্স দেখলে প্রিয়জনকে লেখা প্রিয় চিঠি তার গহ্বরে ফেলতে অনিচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক। বরঞ্চ তু'পা হেঁটে গিয়ে খোদ ডাকখানাতে ফেলাই সহজ। উত্তরকালে আমার এই শঙ্কা অনেকটা কেটেছে ; কলকাতার যেখানে-সেখানে জীর্ণদর্শন বিবর্ণ বাক্সে চিঠি ফেলেও দেখেছি, যথাসময়ে যথাস্থানেই পৌঁচেছে। তারপর শীতকালে কলকাতার বাক্সগুলো যখন সিঁদুরের মত টকটকে রঙ করা হয়, তখন তো তারা রীতিমত সম্ভ্রমেরই উদ্রেক করে ; আমাদের মধুরতম প্রেমপত্রের, আমাদের জরুরিতম ব্যবসা-সংবাদের দায়িত্ব দিয়ে অনায়াসে তাদের বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু কলকাতার বাইরে এলে বালককালের সেই ভয় আবার চাড়িয়ে ওঠে আমার মনে, খুব সাবধানেই চিঠিপত্র ফেলি। কিন্তু এবারের মত ডাকবাংলোর ভাঙাচোরা যা-হোক্ বাক্সের উপরে ভরসা ক'রেই আমাদের চমৎকার চিঠিগুলো ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলুম ; সে-সুযোগও জুটলো না।

হতাশ হ'তে হ'লো : টিকিটে কোনারকের ছাপ-মারা, কাগজের উপর 'কোনারক ডাক-বাংলো' লেখা চিঠি আমাদের আত্মীয়রা আর পেলেন না ; সে-রোমাঞ্চ থেকে বাধ্য হ'য়েই তাঁদের বঞ্চিত করতে হ'লো। বাড়ি থেকে পা বাড়ালেই আমরা এক-একজন মস্ত চিঠি-লিখনেওয়ালা হ'য়ে উঠি ; আমাদের

দাঁতের মাজন আর সাবানের বাক্সর সঙ্গে চিঠির কাগজ আর ফাউণ্টেন পেনের কালিও থাকে আমাদের তোড়জোড়ের অংশ। অবশ্য চিঠি লেখবার সঙ্কল্পটা সাধু, তাতে আশ্চর্য্য হবারও কিছু নেই ; আশ্চর্য্য এই যে সত্যি-সত্যি আমরা চারদিকে প্রচুর পরিমাণেই চিঠি লিখি। একখানা সাবানের অর্দ্ধেকও হয়তো ক্ষয় হয় না, কিন্তু কাগজের বাক্স তলায় এসে ঠেকে। এমন নয় যে আত্মীয়-বন্ধুর বিচ্ছেদে আমরা ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় মুহ্যমান হ'য়ে থাকি ; বরঞ্চ পর্য্যটনের উল্লাসে ও উত্তেজনায় নব-বিবাহিতার পক্ষে মাতৃবিরহ ভুলে থাকাও সম্ভব। তবু এটা কেন হয় যে বাড়িতে ব'সে যে-দূরস্থ বন্ধুর সঙ্গে পত্রালাপের কোনো উপলক্ষ্যই হয় না, বাইরে এসে তাকেও একখানা চিঠি না-লিখলে চলে না যেন। হঠাৎ মনে হয় সুকুমার কী ভালো ছেলে, ছেলেবেলায় কত ভালোবাসতুম তাকে, আর এখন সে কেমন আছে না জানি। সুতরাং তাকেও একখানা চিঠি লিখতে হয়, ভুবনেশ্বর ধর্মশালার ঘরে তক্তপোষে উপুড় হ'য়ে শুয়ে। আর বীণা সেই যে বিয়ের পরে জলপাইগুড়ি চ'লে গেলো, তার তো আর কোনো খোঁজই নেই। অবশ্য দুটো চিঠি তার কবে যেন এসেছিলো, তখন জবাব দেয়া হ'য়ে ওঠেনি এখন একটা চিঠি না লিখলে চলে না। 'প্রিয় বীণা : এখন আমরা চিল্কায়। এমন সুন্দর এই...' চললো চার পৃষ্ঠা অনায়াসে। সারা-রাত ট্রেনে কাটিয়ে সকালবেলা হোটেলে উঠে প্রথমেই মনে হয় চিঠি লেখার কথা ; আর গোরুর গাড়িতে ষোলো ঘণ্টার পরে ডাকবাংলোর আশ্রয় পেয়েই যে কাগজ কলম বার ক'রে নিয়ে বসি তা তো দেখাই গেলো। কোনো বাধা, কোন অসুবিধেতেই এ-উৎসাহ শ্লথ হয় না। ট্রেনের সময় আসন্ন,

এক্ষুনি বেরুতে হবে ষ্টেশনের দিকে; স্যুটকেসের উপরে ব'সে ওরই মধ্যে হু-হু ক'রে দু'খানা পোস্ট্‌কার্ড লেখা হ'য়ে গেলো। সকালবেলা একচোট বেড়িয়ে এসেছি; দুপুরে খাওয়ার পর আবার বেরুবো, গাড়ি যতক্ষণ না আসে, দুটো ফাউন্টেন পেন সমানে কাগজের উপর উড়ে চলেছে। আমরা ক্লান্ত থাকি; কিন্তু চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে না এমন ক্লান্ত কখনোই নয়; আমাদের মোটে সময় নেই, কিন্তু চিঠি লেখবার সময় সব সময়ই।

ভেবে দেখেছি, এর মূলে হয়-তো আমাদের অতি মৃদু নিরীহ গোছের একটু স্নবারি। বেড়াবার মজা কী হ'লো, যদি হাতে-হাতে তখন-তখন সেটা সকলকে জানাতে না-পারলাম? যে-দুর্ভাগারা জলপাইগুড়িতে কি ঢাকায় ব'সে পচছে, কি সেই চিরকালের চির-চেনা কলকাতাতেই আটকে আছে, তারা অন্তত এই রোমাঞ্চময় দেশান্তরের চিঠি পেয়েই ধন্য হোক্। কোনারকে ডাকবাক্স না-থাকাটা শোচনীয় তাদের পক্ষেই—কী চমৎকার চিঠি তারা পেতে পারতো, টাটকা-টাটকা বর্ণনায় যেন সেই জায়গার গন্ধ। আর চিল্কা থেকে যে-সব চিঠি আমরা পাঠিয়েছিলাম, তাতে অসম্পূর্ণ ঠিকানা লিখে পরে আমাদের যে-আপশোষ হয়েছিলো, সে-ও তাদেরই খাতিরে। অত কথাই লিখতে পারলাম, আর মান্দ্রাজ কথাটা লিখতে কী হয়েছিলো। আমরা যে সত্যি-সত্যি মান্দ্রাজ প্রদেশে এসে পড়েছি, এ-কথাটা তারা হয়-তো জানলোই না। 'চিল্কা হ্রদ (মান্দ্রাজ)'—শোনাতোও ভালো। নিজেদের অন্যমনস্কতায় আত্মীয়-বন্ধুদের এ-রকম বঞ্চিত করা কি উচিত?

চিঠি-পত্রে বিজ্ঞপ্তির যে-সব ত্রুটি হয়তো হয়েছিলো, এই বইয়ে সে-সব পুষিয়ে নেয়া হয়েছে, এই ধরণের একটা ব্যঙ্গোক্তি

এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক হয়। সত্যি, এতগুলো পৃষ্ঠা কেন লিখলাম? এর মূলে কি কেবলই আত্ম-নিনাদের প্রবৃত্তি? আমি অবিশ্যি নিজেকে এই কথাই বলি যে এটা আত্ম-প্রচার নয়, আত্ম-প্রকাশ। আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা, অন্তত। বাস্তবপক্ষে, এটুকু সাফাই আমার আছে যে আমার এই রচনায় রটনার অংশ অতি সামান্য। এতে হয়-তো আমি শুধু নিজের কথাই বলেছি; কিন্তু তেমনি, কবিতায় গল্পে উপন্যাসে নিজের কথাই তো আমরা বলি। যাদের আঙুলে লেখার সুড়সুড়ানি তাদের পক্ষে নিছক বাঁচা যথেষ্ট হয় না। তাদের পক্ষে, অভিজ্ঞতা বলতে জীবনের ঘটনাই শুধু বোঝায় না। আরো বলা যায়: ঘটনামাত্রেই অভিজ্ঞতা নয় তাদের পক্ষে। আছে কোনো-কোনো নিবিড় সংবেদনের মুহূর্ত্ত, অবশ্যতই যে বৃহৎ ঘটনা-প্রসূত, তা নয়। হয়তো বিশেষ কিছুই হয়নি; হয়-তো শুধু বৃষ্টির পরে রোদ উঠেছে, কি একটা রেলগাড়ি ছুটে গেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে হা-হা ক'রে—হঠাৎ মনে হ'লো এই তো, এই তো দেখলুম, মনে হ'লো মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বের রহস্য উন্মোচিত হ'লো বুঝি। এই মুহূর্ত্তগুলিই আমাদের জীবনের চিহ্ন, এদের দিকে না-তাকালে বুঝতে পারিনে যে বেঁচেছি। ভাবনার হাওয়ায় তারা চঞ্চল, স্মৃতির কুয়াশায় তারা রঙিন। তারা হারাবে না, তারা পুরোনো হবে না, নতুন হ'য়ে তারা ফিরে আসবে। এই তো কয়েকটি মুহূর্ত্ত কবে ছাড়িয়ে এসেছি, তবু এখনো তাদের দেখতে পাচ্ছি যেন সাদা পাখির ঝাঁক সমুদ্রের দিগন্তে। একদিন হয়-তো দিগন্ত ছাড়িয়ে উড়ে যাবে, রইলো এখানে তাদের পাখার শব্দ, রইলো তাদের উড়ে-চলার হাওয়া।

বুদ্ধদেব বসু প্রণীত :

উপন্যাস

সাড়া, অকর্ম্মণ্য, মন-দেয়া-নেয়া, যবনিকা-পতন, অনেক রকম,
সানন্দা, রডোডেনড্রেন-গুচ্ছ, যেদিন ফুটলো কমল, আমার বন্ধু,
ধূসর গোধূলি, হে বিজয়ী বীর, একদা তুমি প্রিয়ে,
সূর্য্যমুখী, অসূর্য্যম্পশ্যা, লাল মেঘ, পরস্পর,
রূপালি পাখি, বাড়ি-বদল,
বাসর ঘর, পারিবারিক

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে
বিসর্পিল, বনশ্রী

ছোটো গল্প

রেখাচিত্র, অভিনয় অভিনয় নয়, অদৃশ্য শত্রু, মিসেস গুপ্ত,
প্রেমের বিচিত্র গতি, শ্বেত পত্র, ঘরেতে ভ্রমর এলো,
অসামান্য মেয়ে

প্রবন্ধ ও ভ্রমণ

হঠাৎ-আলোর ঝলকানি, আমি চঞ্চল হে, সমুদ্রতীর

কবিতা

বন্দীর বন্দনা, পৃথিবীর পথে, কঙ্কাবতী

ছোটোদের

রঙিন কাচ, ঘুম-পাড়ানি, এলোমেলো, জলতরঙ্গ, সাগর রহস্য
(প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে), কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড,
শনিবারের বিকেল, অপরূপ রূপকথা (হান্স
অ্যাণ্ডারসেনের তর্জমা—৩ খণ্ডে)